গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৫ - ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

এস ইউ সি আই-এর ডাকে

মেজিয়া বনধ সর্বাত্মক

বাঁকুড়া জেলাজুড়ে সফল ছাত্রধর্মঘট

ছাত্রমৃত্যু, পুলিশের গুলি ও পুলিশি তাণ্ডবের প্রতিবাদে প্রচারকারী এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর হামলা সত্ত্বেও ৯ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার মেজিয়ায় ১২ ঘণ্টার সফল বনধ হয়েছে। একইভাবে এ আই ডি এস ও-র ডাকে পালিত হয়েছে জেলা ছাত্রধর্মঘট।

সিপিএমের মদতে কয়লা মাফিয়াদের মাত্রাছাড়া দৌরাত্ম্য ও পুলিশি সন্ত্রাসে মেজিয়ার জনজীবন কতটা বিপর্যস্ত তারই এক মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত হল ৮ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। এ দিন পুলিশের ধাওয়া করা কয়লা বোঝাই একটি লরি স্কুলগামী কিশোর ছাত্র বিশ্বজিৎ গড়াইয়ের জীবন ছিনিয়ে নেয়। মেজিয়া, শ্যামাপুর, তারাপুর প্রভৃতি গ্রামের শত সহস্র মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সিপিএম সরকারের বিরাট পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে এবং ঘটনাস্থল থেকে দূরে মেজিয়া মোড় ও বাজার-দোকান-বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। গোটা এলাকায় পুলিশ ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। গুলিতে দু'জন গুরুতর আহত হন ও আশঙ্কাজনকঅবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সংবাদও প্রকাশ পেয়েছে যে, পুলিশ ঐ দিন লরি ধাওয়া করেছিল তোলা আদায়ের জন্য, কয়লা মাফিয়াদের বেআইনি কারবার রুখবার জন্য নয়। ঘটনার পরপরই এস ইউ সি আই জেলা কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন নাগ, এ আই ডি এস ও-র বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক কমরেড সাবিরুদ্দিন ভুঁইয়া ও সহসভাপতি কমরেড সুজিত রায় শ্যামাপুরে নিহত ছাত্র বিশ্বজিৎ গড়াইয়ের বাড়ি গিয়ে শোকসন্তপ্ত মা-বাবাকে সমবেদনা জানান। মেজিয়া বাজারে গুলিবিদ্ধ আহতদের পরিজনদের সাথেও দেখা করে দলের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানানো হয়।

এই পুলিশি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই জেলা কমিটি পরের দিন ১২ ঘণ্টা মেজিয়া বনধের ডাক দেয়। এ আই ডি এস ও জেলার ছাত্রসমাজকে ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান জানায়। মেজিয়ার সর্বত্র বনধের সমর্থনে এস ইউ সি আই কর্মীরা প্রচার শুরু করেন। মেজিয়া বাজারে কর্মীদের উপর সিপিএম হামলা চালায়, সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এস ইউ সি আই কর্মীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে বলে, ''অন্যায় অত্যাচার যা-ই

আটের পাতায় দেখুন

দিনহাটায় পুলিশের গুলিতে পাঁচজনের মৃত্যু

কোনও প্রতিবাদই সহ্য করতে রাজি নয় সিপিএম

সিপিএম শাসনে গণআন্দোলনে পুলিশি নৃশংসতার আবার এক ভয়াবহ নজির তৈরি হল ৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার জেলার দিনহাটায় ফরওয়ার্ড ব্লকের আইনঅমান্যে। নিরস্ত্র মানুষের মাথা ও বুক লক্ষ্য করে পুলিশের বেপরোয়া গুলি পাঁচটি প্রাণ যেমন কেড়ে নিয়েছে, আহত করেছে অনেককে। পুলিশের গুলিতে আন্দোলনকারী মানুষ লুটিয়ে পড়ছেন মাটিতে, প্রাণ রক্ষার তাগিদে যাঁরা ছুটছেন তাঁদের মাথার পিছন দিকে এসে লাগছে গুলি, রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাজপথ, অন্য কর্মীরা এসে রাস্তা থেকে মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাচ্ছেন— এই দৃশ্য টিভির পর্দায় ফুটে উঠে ঘরে ঘরে মানুষকে শুধু বেদনায় ভারাক্রান্তই করেনি, সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করেছে তাঁদের মনে। এরই প্রকাশ দেখা গেল পরের দিন সর্বাত্মক সফল বাংলা বনধে। ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকা বাংলা বনধের প্রতি এস ইউ সি আই কেবল নৈতিক সমর্থনই জানায়নি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর এই পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছে। এই বনধকে সফল করার জন্য রাজ্যের পাড়ায় পাড়ায় এস ইউ সি আই কর্মীরা ৫ তারিখেই প্রচারে নেমেছিলেন, বনধের দিনও রাস্তায় মিছিল করেছেন তাঁরা।

১০০ দিনের কাজ, বিপিএল তালিকা প্রকাশ, রেশনে চাল-গম সরবরাহ ইত্যাদি সাত দফা দাবিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের এই আইনঅমান্য ছিল পূর্বঘোষিত কর্মসূচি। ঐ দলের জেলা নেতারা বলেছেন, আইন অমান্যে প্রচুর মানুষ আসবে, এ কথা তাঁরা প্রশাসনকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। এরপরেও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর ফ্যাসিস্টসুলভ অত্যাচারকে যারা 'প্রশাসনিক অপদার্থতা' বলে লঘু করে দেখাতে চাইছেন তাঁরা আসলে সিপিএম সরকারকেই আড়াল করতে চান। কিন্তু এ সরকারের অত্যাচারী চরিত্র ও ভূমিকা আজ এতটাই নগ্ন যে, স্বার্থান্বেষী মহল ছাড়া প্রশাসনিক অপদার্থতার অজুহাত অন্য কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। ছত্রভঙ্গ মানুষের মাথা লক্ষ্য করে গুলিচালনা অপদার্থতার পরিচয় দেয় না, পূর্বপরিকল্পনাকেই স্পষ্ট করে।

সাতের পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই লোডশেডিং বন্ধের দাবি জানাল অ্যাবেকা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রায়শই প্রচার করতেন যে, বিদ্যুতে পশ্চিমবঙ্গ একটি উদ্বৃত্ত রাজ্য। সারা ভারতে এই মিথ্যা প্রচারের ঢাক বাজিয়ে জনগণকে রাজ্য সরকার বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এবার সেই ঢাকের পর্দা ফুটো হয়ে কাঁদুনি শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার, সিইএসসি এবং এসইডিসিএল বলে বেড়াচ্ছে যে, চাহিদা বেড়ে গিয়েছে কিন্তু বিদ্যুতের যোগান নেই, তাই লোডশেডিং হচ্ছে।

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিদ্যুতের যোগানের ঘাটতি থাকায় বোরো চাষী, পরীক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, শিল্প-বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটছে। বলা হয়েছে, ৩০০/৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কম পাওয়া যাচ্ছে। অপর দিকে চাহিদা বেড়েছে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট। বিজ্ঞাপনে খুব দ্রুত এই পরিস্থিতির অবসান হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছেন, জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে আবার রাজ্যে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হবে।

গত বছর এপ্রিল মাসে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙে দু'টি বাণিজ্যিক করপোরেট কোম্পানিতে পরিণত করা হয়েছে। রাজ্যের সব ক'টি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন কোম্পানিই বর্তমানে করপোরেট তথা বাণিজ্যিক কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। আর ঐ এপ্রিল মাস থেকেই লাগাতার লোডশেডিং-এর কবলে পড়েছে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি জেলা। গত এপ্রিলে বিদ্যুৎমন্ত্রী ঠিক এবারকার মতোই জানিয়েছিলেন যে, আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আর লোডশেডিং থাকবে না। কিন্তু দেখা গেল, লোডশেডিং বেড়েই চলেছে।

আটের পাতায় দেখুন

ক্যানিংয়ে জনগণের প্রতিরোধে পুলিশ উচ্ছেদ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল

শত শত মানুষের প্রতিবাদী জমায়েত, বনধ ও প্রতিরোধের দৃঢ়পণ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং টাউনে পরিকল্পিত উচ্ছেদ অভিযান থেকে পুলিশকে পিছু হটতে বাধ্য করল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং-এ রেলের বিস্তীর্ণ পতিত জায়গার ওপর বংশপরম্পরায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন এবং কয়েকটি বসতিও গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ, উন্নয়নের নামে তাদের ৩০০ বিঘা জমি থেকে প্রায় ৭০০ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বসতি পরিবারকে বিকল্প পুনর্বাসন ছাড়াই উচ্ছেদ করতে পরপর নোটিশ জারি শুরু করে। এও দেখা যায়, রাজ্যের শাসক দল সিপিএমের নেতারা যথারীতি জনগণের পাশে দাঁড়াবার পরিবর্তে উচ্ছেদের পক্ষেই দাঁড়ান এবং 'উন্নয়নের স্বার্থে উচ্ছেদ মেনে নিতে হবে' বলে প্রচারও শুরু করে দেন। ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় হকার, দোকানদার ও সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়ে এস ইউ সি আই বলে, আবেদন-নিবেদন বা হা-হুতাশ করে উচ্ছেদ আটকানো যাবে না। সিপিএমের মিথ্যা আশ্বাসে ভুললে ঠকতে হবে। বাঁচতে হলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও আন্দোলনের

দুয়ের পাতায় দেখুন

আমাদের বাঁচতে দাও

পাঞ্জাবের আত্মহননকারী কৃষকদের পরিবারগুলির শিশুরা সহ অন্যান্য সদস্যরা

৩১ জানুয়ারি দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভে সামিল হয়ে কেন্দ্রের সিপিএম সমর্থিত ইউ পি এ সরকার এবং পাঞ্জাব সরকারের কৃষকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ঋণের বোঝায় ও মহাজনদের হয়রানির ফলেই এই কৃষকরা আত্মহত্যার পথ নেয়। (দি হিন্দু, ১/২/০৮)

আন্দোলনের চাপে রেশনে এপিএল গ্রাহকদের ১১ মাসের বকেয়া আদায় বসিরহাটে

কয়েক মাস ধরে লাগাতার গণআন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত রেশন ডিলাররা নতি স্বীকার করল। ২২ জানুয়ারি বসিরহাট মহকুমা শ্রমজীবী সংগ্রামী মঞ্চের সাথে বসিরহাট ১নং ব্লক ডিলার অ্যাসোসিয়েশন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে এবং চুক্তিপত্রে নিম্নলিখিত দাবিগুলি মেনে নেয়।

১। সমস্ত এপিএল গ্রাহকদের বকেয়া ১১ মাসের খাদ্যশস্য মাথাপিছু ১০ কেজি করে চার মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হবে। কোন কোন সপ্তাহে বকেয়া খাদ্যশস্য দেওয়া হবে তা লিখে দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

২। প্রতিটি রেশন দোকানে এপিএল, বিপিএল, অন্নপূর্ণা ও অন্ত্যোদয় গ্রাহকদের মাথাপিছু কী পরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ তা বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা হবে।

৩। রেশনে উপযুক্ত মানের খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে।

৪। ভুয়া রেশনকার্ড বাতিল করা হবে।

উক্ত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসিরহাট মহকুমা সংগ্রামী মঞ্চের পক্ষে কমরেড অজয় বাইন, কমরেড নিরঞ্জন মৈত্র (এস ইউ সি আই), কমরেড পৃথ্বীশ বোস, কমরেড জগন্নাথ মণ্ডল (শ্রমজীবী সমন্বয় কমিটি) এবং ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে নিরঞ্জন কর্মকার ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কোকড়া শিক্ষা বাঁচাও কমিটির আন্দোলনের জয়

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার কোকড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন গৃহ নির্মাণে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প থেকে দেড়লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক টাকা তছরুপ করে বিদ্যালয়টির কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছেন বলে অভিযোগ।

গত বছর আগস্ট মাস থেকে কোকড়া শিক্ষা বাঁচাও কমিটির ডাকে মজিরুদ্দিন সরকার, রণজিৎ বর্মন, ললিত কর্মকার প্রমুখের নেতৃত্বে বারবার এসআই, ডিপিও, এসডিও এবং ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ মিছিল ডেপুটেশনের মাধ্যমে তদন্তের জন্য দাবি জানানো হয়। তদন্তে নানা গড়িমসি চললেও শেষপর্যন্ত আবার ডিএম-কে ডেপুটেশন দেওয়ার পর ডিএম তিন মাস সময় চেয়ে নেন।

৬ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে ডিপিও একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হন। ডিপিও প্রধান শিক্ষককে চাপ সৃষ্টি করায় তিনি বিদ্যালয়টির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা নিজে বহন করবেন বলে স্বীকার করেন। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের জয়ে জনমানসে বিপুল সাড়া পড়েছে।

নামখানায় নেতাজী স্মরণ অনুষ্ঠান ও রক্তদান

২৩-২৪ জানুয়ারি সারা বাংলা নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির নামখানা ব্লক শাখার উদ্যোগে ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রভাতফেরি ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজীর জীবন চর্চার অঙ্গ হিসাবে আলোচনাসভা ও চিত্রপ্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করঞ্জলি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বসন্ত প্রামাণিক। আলোচসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা নেতাজী জন্মশতবর্ষ কমিটির বিশিষ্ট সদস্য চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠান সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়।

ক্যানিংয়ে উচ্ছেদ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল

একের পাতার পর

প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। তৈরি হয় 'ক্যানিং রেলওয়ে হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বসতি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলে, আমরা উন্নয়নের বিরোধী নই, কিন্তু আমাদের জীবিকা ও বসবাসের বিকল্প ব্যবস্থা না করে এ ভাবে উচ্ছেদ করে দিলে পরিবার সহ না খেয়ে মরতে হবে। তাই বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা চলবে না। তা ছাড়া এই 'উন্নয়ন' কাদের জন্য? ক্যানিংয়ের এই হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বসতির গরিব মানুষ, যারা বংশপরম্পরায় এই অঞ্চলে বাস করছেন তাদের নির্বিচারে উচ্ছেদ করে কাদের উন্নয়ন করার কথা বলা হচ্ছে? আসলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকাচ্যুত করে এই অঞ্চলে বড় বড় ব্যবসায়ীদের জন্য বিশাল বাজার, শপিং মল, প্রোমোটারির সুযোগ তৈরি করে মুনাফা লুটতে চায় রেল দপ্তর, যার সাথে হাত মিলিয়েছে রাজ্যের সিপিএম সরকার।

প্রতিবাদে ২২ জানুয়ারি ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিসম্বলিত স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কোথায় কীভাবে করা সম্ভব, তার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। কিন্তু বোঝা গেল, রেল কর্তৃপক্ষ ও সরকার উচ্ছেদের পথেই যেতে চায়। ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে উচ্ছেদ করা হবে বলে নোটিশের নামে হুমকিও জারি হয়ে যায়। ৭ ফেব্রুয়ারি এস ডি ও অফিসের সামনে অবস্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ গণসংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। সম্মিলিত কণ্ঠে জানিয়ে দেওয়া হয়, ক্যানিংয়ের অধিবাসীরা মাথা নত করে এই উচ্ছেদ মেনে নেবে না। ৯ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং বনধের ডাক দেওয়া হয়।

এ দিন সকাল থেকেই শুধু হকার, দোকানদার ও বসতিবাসীরাই নন, তাঁদের সমর্থনে দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে চাষীরা এসে সমবেত হন ক্যানিং শহরে। সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় মিছিল-মিটিং। উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যানিং বাজার। কুলতলির এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায় সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও সভায় বক্তব্য রাখেন। পুলিশ তার প্রস্তুতির ব্যবস্থা দেখিয়ে জনগণের মধ্যে ভয় সঞ্চার করতে জলকামানের গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু জনগণ ভীত হওয়ার পরিবর্তে প্রতিরোধ করার আওয়াজ তোলেন। এই প্রতিরোধী মেজাজ দেখেই পুলিশ-প্রশাসন প্রমাদ গোনে এবং সে দিনের মতো উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখে। এই সাফল্যে জনগণ আনন্দিত হলেও এ কথা তাঁরা জানেন, প্রশাসনের এই পিছু হটা সাময়িক। আন্দোলনের গতি শ্লথ হলে তারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আন্দোলনের প্রস্তুতিও জারি আছে। কমিটির সম্পাদক সেকেন্দার জমাদার জানিয়েছেন, বিকল্প পুনর্বাসন না পাওয়া পর্যন্ত উচ্ছেদ ঠেকাতে তাঁদের আন্দোলন চলবেই। এই ঘটনা দলমত নির্বিশেষে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকেই আবার সামনে নিয়ে এল।

ঘাটশিলায় এম এস এস-এর রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল দু'দিনের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলা থেকে রাজ্য কাউন্সিল স্তরের ১৫৫ জন কর্মী-সংগঠক এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ (বাঁদিক থেকে) কমরেডস্ হাসি হোড়, সাধনা চৌধুরী, ছায়া মুখার্জী, মেনকা বসুরায়, কৃষ্ণা সেন ও অনিতা মুখার্জী

কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত 'কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে', 'বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি' এবং 'বিপ্লবী কর্মীদের কর্মপদ্ধতি' — এই তিনটি বই-এর ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা হয়।

সর্বহারার মহান নেতা, নারী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ২৬ জানুয়ারি সকাল ১০টায় শিক্ষাশিবির শুরু হয়। দু'দিনে মোট ৪টি অধিবেশনের মধ্যে তিনটি অধিবেশনে প্রশ্নগুলির ওপর অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। বিভিন্ন স্তরের ৯৯ জন সংগঠক ও কর্মী এই আলোচনায় অংশ নেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন। রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী প্রশ্নগুলি কমরেডদের সামনে রাখেন এবং এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন। এ ছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়, সর্বভারতীয় সহসভানেত্রী কমরেড মেনকা বসুরায়, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কৃষ্ণা সেন, কমরেড অনীতা মুখার্জী প্রমুখ। প্রতিনিধিরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে স্বাস্থ্যচর্চা ও খেলাধুলা হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে সাংগঠনিক সমস্যা ও আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেড ছায়া মুখার্জী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাশিবির শেষ হয়।

এম এস এস কর্মীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে

মেরীগঞ্জ-১ কচিয়ামারা পুলিশ ক্যাম্পে ডেপুটেশন

৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এম এস এস-এর মেরীগঞ্জ-১ অঞ্চলের সদস্যা তাহারুন্নেসার বাড়িতে অতর্কিতে পাঁচ/ছয় জন সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধী তাঁর স্বামীকে না পেয়ে তাঁর উপর হিংস্র হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বেপরোয়া মারধোর করে ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে দিতে বুকে বন্দুক ধরে মেরে ফেলার ভয় দেখায়। তাঁর শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয়, গলায় দড়ি দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে ধর্ষণ ও খুন করার চেষ্টা করে। এই সময় বাইরে রাস্তায় পথচলতি লোকের কথার আওয়াজে এবং একটি বাইকের আলো দেখে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।

২০০৭ সালে সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধী, যারা চুরি, ডাকাতি, খুন, স্মাগলিং করে — প্রাচীন মূর্তি পাচার করার টাকা ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে তাদের দু-জন খুন হয়। সেই খুনের সাথে মেরীগঞ্জের ৬ জন এস ইউ সি আই নেতার নাম জড়িয়ে চার্জশিট দিয়ে পুলিশ হয়রানি করতে থাকে। এম এস এস কর্মীর ওপর দুষ্কৃতীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং এস ইউ সি আই নেতাদের ওপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গত ২৪ জানুয়ারি মেরীগঞ্জ-১ অঞ্চলের কচিয়ামারা পুলিশ ক্যাম্পে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মিছিল করে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মহিলারা আসেন। প্রায় তিন শত মহিলা সহ সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পুষ্প পালের নেতৃত্বে উজালা খান সহ দশ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনে যান। প্রধান বক্তা হিসাবে জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক এবং স্থানীয় নেতা দীন আখতার মিস্ত্রীও বক্তব্য রাখেন।

শহীদ প্রীতিলতা স্মৃতিরক্ষা কমিটির ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

শহীদ প্রীতিলতা স্মৃতিরক্ষা কমিটির পরিচালনায় এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারের সহযোগিতায় ২৩ জানুয়ারি বসিরহাট টাউন হলে একদিনের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন শর্মিষ্ঠা মাইতি, ডাঃ সজল বিশ্বাস, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ নন্দ, অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন দাস। সভাপতিত্ব করেন রাধারানী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দীপান্বিতা দাস। ক্যাম্পে ১৩০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

শেয়ার বাজারে ধস

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মজ্জাগত সংকটেরই প্রতিফলন

সংবাদপত্রের পাতায় শেয়ারবাজারের উত্থান-পতনের হিসাবনিকাশ ইদানীং বড় খবর হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। আমাদের দেশের মানুষের অধিকাংশেরই এ বিষয়ে কোনও আগ্রহ ছিল না। কারণ শেয়ারবাজারে বা ব্যাঙ্কে রাখার মতো টাকা তাদের নেই। মূলত ধনী ও মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তই যায় শেয়ারবাজারে। কিন্তু প্রধানত, টিভি এবং সংবাদপত্রের মাত্রাতিরিক্ত প্রচারের ফলে ইদানিং মানুষের মধ্যে শেয়ারবাজার নিয়ে খানিকটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে, শেয়ারবাজার যখনই তেজি থাকে, তখন তা দেখিয়ে সরকার তাদের আর্থিক নীতির সাফল্যের ঢাক পেটাতে থাকে। আর যখনই শেয়ারবাজার পড়ে যায়, তখন সরকারি কর্তাদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়, জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করা যে, অর্থনীতির খুঁটি মজবুত আছে। যে কথাটা তারা আড়াল করে, তা হল, পুঁজিবাদের বর্তমান তীব্র সংকটের যুগে শেয়ারবাজারের সঙ্গে সরাসরি উৎপাদনের যোগ খুবই ক্ষীণ। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে পুঁজি যে প্রধানত ফাটকা বা পরজীবী চরিত্র নিয়েছে, শেয়ারবাজারের কার্যকলাপ থেকেই তা পরিষ্কার। শেয়ারবাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্বৃত্ত অলস পুঁজির ফাটকা মুনাফা লোটার ক্ষেত্র। তাই প্রায়শই দেখা যায়, কাগজকলমের বাইরে যে কোম্পানির এমনকী অস্তিত্বই নেই, সেই ভুয়ো কোম্পানির শেয়ারও চড়া দরে বিক্রি হচ্ছে।

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কী ঘটেছিল শেয়ারবাজারে

গত জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতের শেয়ারবাজার আবারও মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সংবাদপত্রে এ খবর সকলেই দেখেছেন। ২২ জানুয়ারি মঙ্গলবার এক দিনে মুম্বই শেয়ারবাজারের সূচক (সেনসেক্স) ২২৭৪ পয়েন্ট পড়ে যায়। সংবাদপত্রের হিসাব অনুযায়ী সেদিনেই লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা। এই বিরাট ধস ঠেকাতে নিয়মানুযায়ী বাজার বন্ধ করে দিতে হয়। গত ৮ জানুয়ারি মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারসূচক ছিল ২০,৮৯৩.৩ পয়েন্ট। এরপরই ধারাবাহিক পতনের ফলে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শেয়ারসূচক নেমে আসে ১৫,৩৩৩ পয়েন্টে। অর্থাৎ শেয়ারের দাম প্রায় ২৫ শতাংশ পড়ে যায়। ফলে সকল বিনিয়োগকারীর মোট শেয়ারের দাম থেকে ১,৮০,০০০০ কোটি টাকা উবে যায়।

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, বৃহৎ বিনিয়োগকারীরা সামগ্রিকভাবে সর্বদাই লাভ করে। কারণ বাজার যখন পড়ে, তখন সব শেয়ারের দাম পড়ে না। এমনকী তখন কোনও কোনও বিশেষ শেয়ারের দাম বাড়তেও পারে। কারণ মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত যে ৩০টি শেয়ারের দামের উত্থান-পতনকে হিসাবে নিয়ে শেয়ারসূচক তৈরি হয়, প্রধানত তাই দিয়ে বাজারের উত্থান-পতন মাপা হয়, কিন্তু তার বাইরেও বহু শেয়ার বাজারে থাকে। দেখা যায়, বৃহৎ বিনিয়োগকারী বা মিউচুয়াল ফান্ডের পুঁজি বেশি হওয়ায় তারা বহু শেয়ারে ছড়িয়ে বিনিয়োগ করতে পারে। তা ছাড়া তারা বাজারের চাহিদাকে প্রভাবিত করে দামের ওঠাপড়া ঘটাতেও পারে। ফলে বাজার পড়ে গেলেও তাদের সামগ্রিকভাবে ক্ষতি তো হয়ই না, বরং বহু ক্ষেত্রেই সস্তার বাজারে শেয়ার কিনে মজুত করে তারা ফাটকায় দাম বাড়িয়ে লাভ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের এই ক্ষমতা থাকে না। ফলে বাজার পড়ে গেলে হাজার হাজার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী এবং ছোট দালালরা সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখে পড়ে। কাজেই শেয়ারবাজার সকলকে বড়লোক করে দেবে, এটা পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচার।

সংবাদপত্র থেকে শুরু করে বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গোটা দুনিয়ার শেয়ারবাজারের সঙ্গে ভারতের শেয়ারবাজারের এই ধসের প্রধান কারণ হল, মার্কিন অর্থনীতিতে সংকট এবং আরও গভীরতর সংকটের পূর্বাভাস। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার ০.৭৫ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার পর ভারতের শেয়ারবাজার কিছুটা চাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু যতটা হবে ভাবা হয়েছিল, ততটা হয়নি। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিও গৃহঋণে সুদের হার কমাতে শুরু করেছে। তাহলে কি কেবল মার্কিন অর্থনীতির সংকটটাই এই ধসের মূল কারণ, নাকি ভারতীয় অর্থনীতির সংকটও এর পিছনে আছে, নাকি বহু কারণের সংমিশ্রণে এই ধস ঘটেছে, তা সুনিশ্চিত করে বলা কঠিন।

বিগত বছরখানেক ভারতের শেয়ারবাজার দারুণভাবে চড়ছিল। শেয়ারসূচক প্রায় ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ পয়েন্টে পৌঁছে যায়। প্রধানত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করার জন্যই শেয়ারবাজারের এই ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছিল। সকলেই জানেন, স্টকমার্কেটে দুটি বাজার থাকে। নতুন শিল্পের পুঁজি সংগ্রহের জন্য যে বাজারে শেয়ার বিক্রি করা হয়, তার নাম প্রাইমারি মার্কেট। আর পুরনো শিল্পের শেয়ার হাতবদল হয় যে বাজারে, তার নাম সেকেন্ডারি মার্কেট। সাধারণত বর্তমানে শেয়ারবাজার বলতে সেকেন্ডারি মার্কেটকেই বোঝানো হয়। বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের সংকটের পটভূমিতে ভারতের সেকেন্ডারি শেয়ারবাজারে ফাটকা কেনাবেচায় আপাতত বেশি লাভ দেখেই বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারতের শেয়ারবাজারে ঢুকেছিল। গত জানুয়ারি মাসে মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার ভবিষ্যৎবাণী হতে না হতেই, তারা তাদের শেয়ার বেচে টাকা তুলে নিতে শুরু করাই ভারতের শেয়ারবাজারে ধসের অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন একদল বাজার বিশেষজ্ঞ। গতবছর মার্কিন অর্থনীতি একদফা ধাক্কা খেয়েছিল মর্টগেজ সংকটের আঘাতে। সম্পত্তি বন্ধক রেখে যাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিল, তারা সময়মতো ঋণ বা সুদের টাকা দিতে না পারায় মার্কিন অর্থনীতি গত বছর গুরুতর ধাক্কা খেয়েছিল। এ বছর নতুন আঘাত আসে যখন দেখা যায়, যারা হাউসিং লোন নিয়েছে তারা সময়মতো ঋণ শোধ করতে পারছে না। পরিভাষায় একে বলা হচ্ছে ' সাবপ্রাইম লেন্ডিং ক্রাইসিস'। কী সেটা? প্রথমে বুঝতে হবে, সাবপ্রাইম বলতে কী বোঝায়। যেসব ঋণগ্রহীতার ঋণের টাকা ফেরৎ দেবার ক্ষমতা ভরসাযোগ্য নয়, তারাই পড়ে সাবপ্রাইম গোষ্ঠীতে। পুরনো ঋণের টাকা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে এদের খারাপ রেকর্ডের কারণে সাধারণভাবে এইসব খাতককে ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে চায় না। কিন্তু মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি এমন খাতকদের কোটি কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিল। এইসব খাতকরা দেনা শোধ না দিতে পারায় মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি বিপুল অঙ্কের ঘাটতির মধ্যে পড়েছে।

কেন মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি এত ঝুঁকি নিয়ে ঋণ দিয়েছিল? কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাওয়ায় উৎপাদনমূলক অর্থনীতিতে মন্দার কারণে ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর ডলার জমে গিয়েছিল, যা বিনিয়োগ করতে না পেরে ব্যাঙ্কগুলির লোকসান হচ্ছিল। গতবছরের শেষ তিন মাসে সিটি গ্রুপ অব ব্যাঙ্কস, ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা সহ অন্যান্য মার্কিন ব্যাঙ্ক লোকসানের হিসাব দাখিল করে। কেন মার্কিন ঋণগ্রহীতারা ঋণ শোধ দিতে পারছে না? কারণ, মার্কিন অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান চাহিদা চাঙ্গা রাখতে ইতিমধ্যেই নানাভাবে উৎসাহ দেওয়ার ফলে, মার্কিন নাগরিকরা ঋণ নিয়ে খরচ করতে অভ্যস্ত হয়ে সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করে ফেলেছে। বাড়তি ঋণ শোধ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে জমিবাড়ি সহ সবরকম ভোগ্যপণ্যের বাজারে চাহিদার অভাব আরও বেশি দেখা দিতে যাচ্ছে, এই আশঙ্কা বাস্তব হয়ে দেখা দেয়।

মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা মানে হল, বিশ্বের বহু দেশের রপ্তানি ব্যবসা মার খাওয়া। কারণ আমেরিকা আজও ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক দেশ। ফলে যে সব দেশ আমেরিকার বাজারে ভোগ্যপণ্য রপ্তানি করে, সে সব দেশের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়বে। ভারতের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর একটা কারণ। তা হল সম্প্রতি ভারতের ফাটকাবাজারে বিপুল বিদেশি বিনিয়োগের ফলে টাকার দাম বাড়ছিল। এই অবস্থায় তারা দেখল, যদি তারা ভারতের বাজারে কেনা শেয়ার বেচে দেয়, তবে লাভ অনেক। কীভাবে হবে লাভটা? মনে রাখা দরকার, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের শেয়ারবাজারে বেচাকেনা করে টাকায়, ডলারে নয়। বিনিয়োগ করার জন্য সর্বপ্রথম তারা তাদের ডলার টাকায় পরিবর্তিত করে নেয়, তারপর টাকা দিয়ে বাজার থেকে শেয়ার কেনে এবং বিক্রিও করে টাকায়। তারপর বিক্রির টাকাটা ডলারে পরিবর্তিত করে। ধরা যাক, ডলারের বিনিময় মূল্য যখন ৪৭ টাকা, তখন একজন বিনিয়োগকারী এক ডলার টাকায় পরিবর্তিত করে ৪৭ টাকা দামের একটা শেয়ার কিনেছে। এবার টাকার দাম বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ টাকা ডলার (যা এখন চলছে)। হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা যদি ধরেও নিই যে, শেয়ারের দাম একই থাকছে, তাহলেও তার লাভ দাঁড়াচ্ছে ৭ টাকা। কারণ তিনি যদি ৪৭ টাকায় যে শেয়ারটা কিনেছিলেন, সেটা এখন ৪৭ টাকাতেও বিক্রি করেন এবং টাকাটা ডলারে পরিবর্তিত করেন, তবে তিনি ৪০ টাকার বিনিময়ে পাবেন এক ডলার এবং বাড়তি থাকবে ৭ টাকা, যেটা টাকার দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে তার লাভ। বিশ্ববাজারে মন্দার আশঙ্কা, নাকি ডলারের তুলনায় টাকার দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে শেয়ার বেচে বাড়তি মুনাফার লোভ — প্রধানত কোনও কারণে ভারতের শেয়ারবাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা পালাতে শুরু করেছিল, তা নিয়ে বাজার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে সম্ভবত এই দুটি এবং অন্য আরও কিছু কারণ মিলেমিশে গত জানুয়ারিতে ভারতের শেয়ারবাজারে ধস নামিয়েছিল এমন ধারণাও অমূলক নয়। সেই সাথে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই যেভাবে ভারতের কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক গৃহঋণে সুদের হার কমাবার কথা ঘোষণা করেছে এবং অচিরেই অন্যান্য ব্যাঙ্ক যা না করে পারবে না, তা পরিষ্কার দেখাচ্ছে, ভারতের সবচেয়ে লাভজনক বলে পরিচিত জমি-বাড়ির ব্যবসায় রাহুর দশা লাগা শুরু হয়েছে। কাজেই আমেরিকাতে বাজারের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেও চাহিদার অভাবজনিত সংকট, বা মন্দার আশঙ্কা কাজ করেছে বলাই যায়, যদিও তার সাথে ফাটকাবাজদের কারসাজিও কাজ করেছে।

> সাধারণত বর্তমানে শেয়ারবাজার বলতে সেকেন্ডারি মার্কেটকেই বোঝানো হয়। বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের সংকটের পটভূমিতে ভারতের সেকেন্ডারি শেয়ারবাজারে ফাটকা কেনাবেচায় আপাতত বেশি লাভ দেখেই বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারতের শেয়ারবাজারে ঢুকেছিল।

ফাটকা ছাড়া আজ পুঁজিবাদ টিকতে পারে না

বর্তমানে কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে ঘরে বসে কিছুটা সময় দিলেই শেয়ারবাজারে কেনাবেচায় অংশগ্রহণ করা যায়। এজন্য বাজারে হাজির থাকার দরকার পড়ে না। যাঁর বিনিয়োগ করার মতো কিছু সঞ্চয় আছে, আগে তাঁরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন। ব্যাঙ্ক সেই টাকা শিল্পপতিদের ঋণ দিত, যা পুঁজি হিসাবে নতুন শিল্পে বা পুরানো শিল্পের উন্নতিকল্পে বিনিয়োজিত হত। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদী বাজারসংকটের জন্য শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ ক্রমশ কমে এসেছে এবং পুঁজি ক্রমশ বেশি বেশি করে অলস হয়ে পড়ছে। সেই বিপুল পরিমাণ অলস পুঁজি প্রধানত খাটছে শেয়ারবাজারে পুরনো শেয়ারের ফাটকা বেচাকেনায়। কাজেই শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ বাড়ছে মানেই নতুন শিল্প হচ্ছে, তা নয়।

সকলেই ইদানীং লক্ষ্য করছেন, যাতে শেয়ারবাজারে পুঁজি যায়, সে জন্য সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম নেতারা যখন বোঝাচ্ছেন, পুঁজির জন্য শিল্পপতিদের ভজনা করা ছাড়া উপায় নেই, তখন এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই হাজার হাজার কোটি টাকার সঞ্চয় চলে যাচ্ছে শেয়ারবাজারে। পুঁজির জন্য রাজ্য সরকার টাটা-বিড়লার ভজনা করছে, অথচ এই দিকে তাদের কোনও নজর নেই। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার চাইলে নতুন শিল্প গড়ার জন্য বাজারে শেয়ার বা বন্ড বেচে মূলধন তুলতে পারত না কি? মূলধন ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা যেখানে বেসরকারি মালিকদের চেয়ে অনেক বেশি, সেখানে বেসরকারি মালিকরা যদি শেয়ারবাজার থেকে পুঁজি তুলতে পারে, তবে সরকার পারবে না কেন? যদি সে চেষ্টা করে তারা ব্যর্থ হত, তখন ব্যর্থতার কারণটা বিচার্য হত। কিন্তু

চারের পাতায় দেখুন

> সি পি এম ফ্রন্ট সরকার চাইলে নতুন শিল্প গড়ার জন্য বাজারে শেয়ার বা বন্ড বেচে মূলধন তুলতে পারত না কি? মূলধন ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা যেখানে বেসরকারি মালিকদের চেয়ে অনেক বেশি, সেখানেবেসরকারি মালিকরা যদি শেয়ারবাজার থেকে পুঁজি তুলতে পারে, তবে সরকার পারবে না কেন?

আজকের যুগে শেয়ার বাজার প্রধানত সেকেন্ডারি বাজার

তিনের পাতার পর

বাস্তবে টাটা-আম্বানির মতো মালিকদের মুনাফার স্বার্থে সরকারি তরফে তেমন কোনও চেষ্টাই তাঁরা করেননি। সি পি এম নেতারা যতই 'শিল্পায়ন' বা 'কর্মসংস্থানের' ধুয়ো তুলুন, কার্যত শিল্পায়ন যে আজ আর সম্ভব নয় তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে, ক্রমাগত বেশিরভাগ পুঁজির অনুৎপাদক ফাটকাবাজারে চলে যাওয়া।

বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্তমান সংকটের যুগে শেয়ারবাজার হল এমন একটা বাজার, যার কাজ হল, প্রধানত অলস পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা করে দেওয়া। তা ছাড়া, বাজারসংকটের মধ্যেও সীমিত কোনও ক্ষেত্রে যদি শিল্প স্থাপনের সুযোগ থাকে, তা কাজে লাগানোর জন্য বা পুরনো শিল্পের আধুনিকীকরণ করার জন্য শিল্পপতিদের যখন পুঁজি দরকার হয়, তখন তারা প্রয়োজন মতো যে কোনও সময় পুঁজি পেতে পারে শেয়ারবাজার থেকে, যে পুঁজির জন্য তাদের কোনও ঝুঁকি নিতে হয় না। সকলেই লক্ষ করেছেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আম্বানিদের রিলায়েন্স পাওয়ার কোম্পানি বাজার থেকে ১১,৭০০ কোটি টাকার পুঁজি মাত্র ৫৮ সেকেন্ডের মধ্যেই তুলে নিতে পেরেছিল। এইভাবে শিল্পপতিদের জন্য পুঁজির যোগান দেওয়ার কাজটা শেয়ারবাজার দীর্ঘদিন ধরেই করে এসেছে, কিন্তু বর্তমানে সংকটের ফলে শেয়ারবাজারের কাজটা আর এত সোজা সরল নেই।

শেয়ার বাজারে শেয়ার কেনাবেচা কীভাবে হয়

পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে মাঝে মাঝে সংকট সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পের যখন বিকাশ ঘটছিল, তখন পুঁজি সংগ্রহের জন্য শিল্পপতিদের স্বার্থেই শেয়ারবাজার তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষে বোম্বাইতে ১৮৭৫ সালে নেটিভ শেয়ার অ্যান্ড স্টক ব্রোকার অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত শেয়ারবাজার হল এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন শেয়ারবাজার। মনে করা যাক, কোনও শিল্পপতি এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে একটা শিল্প গড়তে চান। সাধারণত দেখা যায়, তিনি কুড়ি লক্ষ টাকার শেয়ার নিজের হাতে রেখে বাকিটা বাজার থেকে তোলেন। বাকি ৮০ লক্ষ টাকার জন্য যদি ১০ টাকা মূল্যের ৮০,০০০ শেয়ার ছাড়া হয়, তবে যিনি ১০ টাকা দিয়ে ১টি শেয়ার কিনবেন, তিনি আইনত কোম্পানির ৮০ হাজার ভাগের এক ভাগের মালিক এবং তদনুপাতে লাভ-ক্ষতির দায়ভাগী। কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আইনকানুনগুলি এমনভাবে করা থাকে, যাতে কোম্পানির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ পুঁজি বিনিয়োগকারী মালিকই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিকানার জোরে গোটা কোম্পানির মালিক হিসাবে কাজ করে। সাধারণত দেখা যায়, ৫০ শতাংশ পুঁজি সংগৃহীত হয় বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিক হলেও কোম্পানি পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে না, স্লিপিং পার্টনারের ভূমিকায় থাকে।

একচেটিয়া পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের যুগে এসে শেয়ারবাজারের ভূমিকাকে অনেকটা গৌণ করে দিয়ে ব্যাঙ্কের আধিপত্য কীভাবে বাড়তে থাকে, তা লেনিনই দেখিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেযুগেও পুঁজিবাদী বাজারের যতটুকু স্থিতিশীলতা ছিল, বর্তমান যুগে তা নেই। সেদিন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পুঁজিবাদ সঞ্চয়কারীদের যতটুকু সুদের নিশ্চয়তা দিতে পারত, আজকের সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ তাও দিতে পারে না। তাই পরিকল্পিতভাবেই সঞ্চয়কারীদের সামনে থেকে নিশ্চিত আয়ের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তাদের অনিশ্চিত শেয়ারবাজারের দিকে *ঠেলে* দেওয়া হচ্ছে। একচেটিয়াকরণের যুগে পুঁজির যোগান দেওয়া ছাড়াও লগ্নিপুঁজি বিদেশে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি বাহন হিসাবে কাজ করেছিল এবং দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি লগ্নির পথ সহজতর করেছিল। পুঁজিবাদের বর্তমান চূড়ান্ত সংকটের যুগে ব্যাঙ্কপুঁজিও অলস হয়ে পড়ছে এবং যত অলস হচ্ছে, ততই মুনাফার তাগিদে তা শেয়ারফাটকায় ঢুকছে। ফলে ব্যাঙ্কপুঁজি, আর শেয়ারবাজারের ফাটকা পুঁজির মধ্যেকার পার্থক্য ক্রমশ কমে আসছে।

বিশ্বপুঁজিবাদের বর্তমান তৃতীয় তীব্র বাজার সংকটের যুগে শেয়ারবাজার কোম্পানিগুলিকে পুঁজি যোগান দেওয়া ছাড়াও একটা বাড়তি কাজ করে। তা হল, উদ্বৃত্ত অলস পুঁজির ফাটকা বিনিয়োগ ও মুনাফার রাস্তা করে দেওয়া, যা ব্যাঙ্ক করতে পারে না। প্রধানত দ্বিতীয় কাজটার জন্যই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শেয়ারবাজার আজ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে চূড়ান্ত বাজারসংকটের ফলে শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ খুবই কম। কিন্তু তার মধ্যেও যখন যতটুকু সুযোগ থাকে, তাকে কাজে লাগাতে একচেটিয়া মালিকরা যখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নতুন শিল্প গড়ে, তখন তাদের পুঁজি জোগায় শেয়ারবাজার। কিন্তু বাজারের সামগ্রিক বেচাকেনায় নতুন শিল্পের শেয়ারের (আই পি ও) অংশ খুবই কম। যে শেয়ারবাজারের উত্থান-পতনের কথা সংবাদপত্রে এত লেখা হয়, তা হল, সেকেন্ডারি মার্কেট, যেখানে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত পুরনো শিল্পের শেয়ার, এমনকী কখনও কখনও লালবাতি জ্বেলে উঠে-যাওয়া শিল্পের শেয়ারও হাতবদল হয়। চাহিদা-যোগানের প্রচলিত পুঁজিবাদী নিয়মে অথবা পুঁজির জোরে কৃত্রিমভাবে চাহিদা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে পুরনো শেয়ারের দামের ওঠাপড়া ঘটিয়ে নানা কৌশলে তার হাতবদল থেকে লাভ ওঠানোর ফাটকা কারবারই প্রধানত চলে সেকেন্ডারি মার্কেটে। তার উপর শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ কমে আসায় অলস হয়ে পড়ছে যে পুঁজি, তা খাটাবার রাস্তা করে দেয় এই সেকেন্ডারি শেয়ারবাজার। পুঁজিবাদী সংকটের বর্তমান যুগে 'শেয়ারবাজার' — আসলে যা প্রধানত সেকেন্ডারি বাজার — তা সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক বহুলাংশে হারিয়েছে। তাই অর্থনীতিতে তেজিভাব না থাকলেও বর্তমানে প্রায়ই শেয়ারবাজার খুব তেজি থাকতে দেখা যায়। এখন বিশাল বিশাল মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানি শুধুমাত্র শেয়ারের ফাটকা কারবার করে শত শত কোটি টাকা মুনাফা করে। এটাই তাদের ব্যবসা। শিল্পে যেমন উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করতে পারলে তবে লাভ হয়, বিক্রি না হলে শিল্প সংকটে পড়ে, শেয়ারবাজার তেমন নয়। এই বাজারের বৈশিষ্ট্য হল, এখানে কোনও কিছু উৎপাদন করা ছাড়াই 'লাভ' হতে পারে। কীভাবে তা হয়?

> তা ছাড়া কেবল সংকটের চাপেই পুঁজিবাদ ভেঙে পড়বে এমন কথা মার্কসবাদ কোথায় বলেছে তা কেবল ওই সব 'বিশেষজ্ঞরা'ই বলতে পারেন। প্রকৃত মার্কসবাদীরা জানেন, আপন নিয়মে পুঁজিবাদ ভেঙে পড়বে — এটা মার্কসের শিক্ষা নয়।

উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি কোনও সম্পর্ক ছাড়াই মুনাফা লুটবার বাজার

ধরা যাক, কোনও বিনিয়োগকারী বিশেষ একটি কোম্পানির ১০ টাকা মূল্যের ১০টি শেয়ারের মালিক। বাজারে যখন অলস পুঁজি বিনিয়োগের ঢল নামছে, তখন সেই শেয়ার মালিক তার শেয়ার নিলামে তুলে বলে 'আমি শেয়ার প্রতি ১৪ টাকা দর পেলে শেয়ার বেচে দেব'। এই কথাটা আজ আর তাকে শেয়ারবাজারে এসে সরাসরি খদ্দেরদের বলতে হয় না, সে দরটা কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার শেয়ার দালাল ও খরিদ্দারদের মুহূর্তের মধ্যে জানিয়ে দেয়। যদি সেই দামে বিক্রি হয় ত ভালো, না হলে একই পদ্ধতিতে সে কম দর দেয়। ধরা যাক, সেই শেয়ার ১২ টাকা দরে বিক্রি হয়ে গেল। সে ক্ষেত্রে কোনও খাদ্যদ্রব্য বা যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও বিক্রি করে নয়, স্রেফ শেয়ারের কাগজখানা বেচে সে শেয়ার প্রতি দু'টাকা লাভ করে। যে ১২ টাকা দরে শেয়ার কিনছে, সে কিনছে এই আশায় যে, পরে চাহিদা আরও বাড়লে সে ১৩ টাকা দরে বেচতে পারবে। যে ১২ টাকা দরে শেয়ার বেচে দু'টাকা করে লাভ করল, সে আসলে কোনও উৎপাদন ছাড়াই লাভ পেল। আরও বাড়তি দরের আশায় সে যদি শেয়ারগুলি না বেচে ঘরে রেখে দিত, তবে এই ভেবে সে খুশি থাকত যে, তার শেয়ারের দাম যেহেতু দু'টাকা বেড়েছে, তাই হাতে টাকা না পেলেও আসলে তার দু'টাকা লাভ হয়েছে। কারণ, তার ১০ টাকা মূল্যের ১০টি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ১২০ টাকা। এইভাবে শিল্পে বিনিয়োজিত পুরনো শেয়ারের দাম ফাটকায় যত বাড়তে থাকে, ততই নতুন বিনিয়োগ না হলেও শেয়ারের মোট মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়তে থাকে, সৃষ্টি হয় অদৃশ্য মুনাফা, বা পরিভাষায় যাকে বলে ভার্চুয়াল মানি, যা বাস্তবে নেই। বাস্তবে নেই বলে তা বাজারে এসে টাকার যোগান বাড়িয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাড়তি সংকট ডেকে আনে না। উল্টোদিকে যদি শেয়ারবাজারে মন্দা দেখা দেয়, অর্থাৎ কোনও বাস্তব কারণে বা কল্পিত আশঙ্কা থেকে বিনিয়োগকারীরা হাতের শেয়ার বেচে দিতে চায় বা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী না হয়, তাহলে শেয়ারের দর পড়ে যায়। ধরা যাক, আমাদের কল্পিত বিনিয়োগকারীর ১০ টাকা মূল্যের শেয়ারের দর ৮ টাকা হয়ে গেল, তখন সে কী করবে। হয় তাকে লোকসানে বেচে দিতে হবে, না হয় ক্ষমতা থাকলে তখন সে ধরে রাখবে ভবিষ্যতে দর বাড়ার আশায়। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সর্বদা ফাটকাবাজারে সংযম রক্ষা করার উপদেশ দেন, যা অসম্ভব। যদি বিনিয়োগকারী নিজের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে বিনিয়োগ করে, তবে ক্ষতি তার সামর্থ্যের মধ্যে থাকে। তবে বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীই অধিক মুনাফার আশায় ধার করে বিনিয়োগ করে থাকে। যেহেতু শেয়ারবাজার তেজি রাখার প্রধান শর্ত হল, ক্রমাগত বিনিয়োগের স্রোত বজায় রাখা, তাই ধার করে বিনিয়োগের ব্যবস্থা রাখা বাস্তবে অপরিহার্য, এবং কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করে রাখে। কাজেই জুয়াড়ি চরিত্রের ফাটকা বাজার চালু রেখে খেলুড়েকে সংযম রক্ষা করার উপদেশ দেওয়া, চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকার উপদেশ দেওয়ার মতো।

শেয়ারবাজারে ক্ষতির দায় কার

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বলে থাকেন, শেয়ারবাজারের চালিকাশক্তি হল, আশা এবং আশঙ্কা। কীসের আশা পরিষ্কার করে তাঁরা না বললেও বোঝা কঠিন নয় যে, সেটা লাভের আশা। বিপরীতটা হল লোকসানের আশঙ্কা। পুঁজিবাদী অর্থনীতির একমাত্র চালিকা শক্তি হল মুনাফা, তাই শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি কম নিতে বলাটা বাস্তবে অর্থহীন। যাতে সাধ্যাতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে মানুষ বিনিয়োগ করে, তাই শেয়ারবাজারে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে পুরো টাকা না দিয়েও শেয়ার কেনা যায়। সাধারণভাবে আমাদের দেশে ২৫ শতাংশ মার্জিন মানি দিয়ে দালালের কাছে শেয়ার বুক করা যায়। অর্থাৎ যাঁর পুঁজি এক লক্ষ টাকা, তিনি সেই টাকা খাটিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনতে পারেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি দাম পড়ে যায়, তাহলে দালাল কম দরেই শেয়ার বেচে নিজের টাকা তুলে নেয়, ঘাটতির টাকাটা মূল ক্রেতাকে দিতে হয়। অর্থাৎ ধরা যাক, কেউ যদি ২৫০০ টাকা দিয়ে ১০,০০০ টাকার শেয়ার বুক করে থাকে এবং বাজারদর ১০ শতাংশ পড়ে যায়, তবে ১০,০০০ টাকার শেয়ারের দাম দাঁড়াবে ৯০০০ টাকা। দালাল সেই দরেই শেয়ার বেচে দিয়ে ৯,০০০ টাকা তুলে নেবে, মূল ক্রেতাকে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাজার পড়তে শুরু করলেই শেয়ার ক্রেতারা লোকসান খেতে থাকে। পতনের হার যদি এত বেশি হয় যে, ক্রেতারা ঘাটতি পূরণ করতে না পারে, তাহলে ক্ষতির দায় দালালের কাঁধে এসে পড়ে। তাই বড় ধসের পর অনেক সময় ছোট দালালদের আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে দেখা যায়।

> পুঁজিবাদী সংকটের বর্তমান যুগে 'শেয়ারবাজার', আসলে যা প্রধানত সেকেন্ডারি বাজার, তা সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক বহুলাংশে হারিয়েছে। তাই অর্থনীতিতে তেজিভাব না থাকলেও বর্তমানে প্রায়ই শেয়ারবাজার খুব তেজি থাকতে দেখা যায়। এখন বিশাল বিশাল মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানি শুধুমাত্র শেয়ারের ফাটকা কারবার করে শত শত কোটি টাকা মুনাফা করে। এটাই তাদের ব্যবসা।

ইদানীং যে ভারতের শেয়ারবাজার ক্রমাগত চড়ছিল, তার পিছনে প্রধানত ছিল বিদেশি লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ। ভারতে শেয়ারের ফাটকা দর যেভাবে চড়ছিল, তাতে বিদেশের ব্যাঙ্ক বা শেয়ারবাজারে টাকা রাখার চেয়ে ভারতের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ ছিল লাভজনক। কিন্তু মার্কিন অর্থনীতির মন্দার আশঙ্কার কথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে এই আশঙ্কা দেখা দেয় যে, বিনিয়োগের হার কমে আসবে। আর বিনিয়োগ কমা মানেই হল, শেয়ারবাজারে তেজিভাব ঢিমে হয়ে যাওয়া ও লাভের হার কমে যাওয়া। লাভ কমার আশঙ্কা দেখা দেওয়া মাত্র বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের শেয়ারবাজার থেকে নিজেদের মূলধন যতটা পারে তুলে নেওয়ার চেষ্টায় দাম থাকতে থাকতে যতটা বেশি সম্ভব শেয়ার বেচে দিতে শুরু করে। সংবাদে প্রকাশ, ধসের সময় এমনকী মাত্র দশ দিনের মধ্যে ১০,৫০০ কোটি টাকা তারা তুলে নেয়। শেয়ার বিক্রির এই ঢল নামার সাথে সাথে শেয়ারের দামও পড়তে শুরু করে। এইভাবে চক্রাকারে বাজারদর নামার ফলে বিক্রি বৃদ্ধি, আবার বিক্রি বৃদ্ধির ফলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

গাজায় অবরুদ্ধ প্যালেস্তিনীয় জনগণ ইজরায়েলি পাঁচিল ভেঙে দিল

প্যালেস্তিনীয় জনগণ আবার প্রমাণ দিল, স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নে তারা আজও কতটা দৃঢ়চিত্ত। গত ২৩ জানুয়ারি নিশ্ছিদ্র ইজরায়েলি ঘেরাটোপে বন্দী গাজার জনগণ ভেঙে ফেলল তাদের মিশর সংলগ্ন সীমানা পাঁচিল। খাদ্য, পানীয় বন্ধ করে, এমনকী বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দিয়ে ইজরায়েলি শাসকরা গাজার প্যালেস্তিনীয় জনগণকে মাথা নত করাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। গাজার জনগণের সাহসিকতা ও দৃঢ়তার কাছে পরাজিত হয়েছে ইজরায়েলি শাসকদের চোখরাঙানি। গাজার জনগণ আবার এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মধ্যপ্রাচ্যের বুকে, যা বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের কাছে প্রেরণা হিসাবে এল।

আজকের ইজরায়েলের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এক সংকীর্ণ ভূখণ্ড হল গাজা। সরু ফিতের মতো এই সংকীর্ণ ভূভাগটির তিন দিক ঘিরে রয়েছে ইজরায়েল। চতুর্থ দিকটিরও এক বড় অংশ ইজরায়েলেরই নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু এই দিকের একটিমাত্র অংশ মিশর সংলগ্ন। মাইল সাতেক লম্বা এই অংশটির নাম রাফা সীমানা।

আজকের ইজরায়েল নামে পরিচিত দেশটির ঐতিহাসিক পরিচিতি কিন্তু প্যালেস্তাইন নামে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে পশ্চিম এশিয়ার এই ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর সংলগ্ন দেশটির কর্তৃত্ব পরাজিত অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের হাত থেকে হস্তান্তরিত হয় জয়ী মিত্রপক্ষের হাতে। মিত্রপক্ষের হয়ে ফরাসী ও ব্রিটিশ বাহিনী এই তাবৎ অঞ্চলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগিতে ফরাসীদের হাতে যায় উত্তরের দুই দেশ লেবানন ও সিরিয়া, আর দক্ষিণের দুই দেশ প্যালেস্তাইন ও জর্ডনের কর্তৃত্ব যায় ব্রিটিশদের হাতে।

প্যালেস্তিনীয়দের নিজ দেশেই পরবাসী করে দেওয়া হয়

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পবিত্র শহর নাজাফ ও জেরুজালেম ভৌগোলিকভাবে এই প্যালেস্তাইনের অন্তর্গত। তাই এই অঞ্চলের প্রতি সাধারণ ইহুদীদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে এই সময় থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ধনী ইহুদীরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই অঞ্চলের বিপুল ভূ-সম্পত্তি কিনে নিতে শুরু করে। দেশের গরিব সাধারণ মানুষের নিজভূমে পরবাসী হয়ে পড়ার সূচনা সেই সময় থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এই প্রক্রিয়ার গতি ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পায়। নাৎসি কবলিত সমগ্র ইউরোপে সাধারণ ইহুদীদের উপর ভয়াবহ অত্যাচারের অসংখ্য ঘটনা সেইসময় স্বাভাবিকভাবেই সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ইহুদীদের দিকে নিয়ে যায়। 'দেশহীন জাতি' হিসাবে ইহুদীদের দীর্ঘদিনের এই পরিচিতি এই পরিস্থিতিতে আবার সামনে আসে এবং ইহুদীদের একটি নিজস্ব দেশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষের ইহুদীদের প্রতি সেই সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এবং ইহুদীদের একটি নিজস্ব দেশ চাই এই দাবিকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদীরা আবার তৎক্ষণাৎ শুরু করে দেয় তাদের নতুন খেলা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল আরব ভূখণ্ডের তৈল সম্পদ

আরব ভূখণ্ডে তৈল সম্পদের প্রাচুর্য তখন সদ্য আবিষ্কৃত। দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন শিরোমণি হিসাবেও আবির্ভূত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বিশ্বের তৈলবাণিজ্যের কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখাই তখন তাদের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে তাদের তখন দরকার আরব ভূখণ্ডে নিজস্ব কর্তৃত্বাধীন একটি পুতুলরাষ্ট্র। ইহুদীদের জন্য নতুন রাষ্ট্রের দাবিটিকে সামনে রেখেই তারা শুরু করল তাদের কাজ। ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন প্যালেস্তাইনের প্রকৃত কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া হল উগ্র ইহুদীবাদীদের হাতে। এই উগ্র ইহুদীবাদী জিওনিস্ট গুণ্ডাবাহিনীকে দিয়ে প্রায় বন্যা বইয়ে দেওয়া হল নির্বিচার খুন, জখম ও ধর্ষণের। নিরীহ গরিব প্যালেস্তিনীয়দের দলে দলে উৎখাত করা হল নিজেদের গ্রাম ও শহর থেকে। সেই নিরস্ত্র অসহায় বুভুক্ষু উদ্বাস্তু লাখো লাখো প্যালেস্তিনীয় জনগণকে রীতিমতো বাধ্য করা হল দেশ ছাড়তে। ঘরবাড়ি, দীর্ঘদিনের বাসভূমি সব হারিয়ে তাদের ঠাঁই হল পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন আরব দেশের নানা উদ্বাস্তু শিবিরে। আর সেইসব উৎখাত হওয়া প্যালেস্তিনীয় সাধারণ মানুষের স্থানে নতুন করে বসতি স্থাপন করা হল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নাৎসিদের হাতে অত্যাচারিত ইহুদিদের। এই প্রক্রিয়াতেই ১৯৪৮ সালে জন্ম হল নতুন দেশ ইজরায়েলের। নামটি অবশ্য নেওয়া হল ইহুদিদের পৌরাণিক গাথা থেকে। আর ইতিহাসের প্যালেস্তাইনকে মুছে ফেলা হল ভূগোলের পাতা থেকে।

কিন্তু চাইলেই তো আর মুছে ফেলা যায় না একটা দেশকে। ঠিক তাই ঘটল প্যালেস্তাইনের ক্ষেত্রে। দেশ থেকে উৎখাত হওয়া প্যালেস্তিনীয় জনসাধারণ নতুন করে সংগঠিত হতে শুরু করল উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতেই। আর উগ্র ইহুদিবাদী জিওনিস্টরা হাজার অত্যাচার চালিয়েও তাদের সকলকে দেশছাড়া করতে সক্ষম হল না। নিজ আদি বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়েও প্যালেস্তিনীয়দের এক বিরাট অংশ থেকে গেল দেশের মধ্যেই। দেশের পশ্চিমপ্রান্তে জর্ডন নদীর পশ্চিমতীর এবং দেশের দক্ষিণপ্রান্তে মিশরের সিনাই মরুভূমি সংলগ্ন গাজা নামক দুই সংকীর্ণ মরুপ্রায় ভূখণ্ডে নতুন করে সমবেত হয়ে শুরু করল তারা তাদের উদ্বাস্তু শিবিরের নতুন জীবন। অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেও এই নতুন দুই সংকীর্ণ আবাসভূমিকে কেন্দ্র করেই তারা শুরু করল স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার আন্দোলন। দাবি তুলল দেশ ফেরতের।

প্রথম দিকে ইহুদিদের প্রতি পৃথিবীব্যাপী সমবেদনার সুযোগ নিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের প্রতি এই বঞ্চনার ইতিহাসকে কিছুটা ঢেকে রাখা সম্ভব হলেও, আজ সারা পৃথিবীই জেনে ফেলেছে এই ইতিহাস। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার এক অন্যতম কেন্দ্রও যে এই প্যালেস্তাইন সমস্যা, তাও আজ অজানা নয়। দীর্ঘদিনের একটানা সুতীব্র সংগ্রামের পথে প্যালেস্তিনীয়রা বর্তমানে পশ্চিম তীরে ও গাজা অঞ্চল দুটিতে নিজেদের জন্য স্বশাসন অর্জন করেছে। কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সমস্ত দাবি আজও চূড়ান্তভাবেই উপেক্ষিত। শুধু তাই নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলি সাম্রাজ্যবাদ এখনও অস্ত্রের জোরেই তাদের সমস্ত দাবি এবং আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করতে সদা উদ্যত। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্প্রতিক ঘটনাটিকেও দেখা প্রয়োজন।

ফাতাহ নেতৃত্বের আপসমুখী ভূমিকাই হামাসকে সামনে নিয়ে এল

প্রয়াত ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে 'ফাতাহ' আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে প্যালেস্তিনীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজা অঞ্চলে তাদের জন্য সীমিত হলেও স্বশাসনের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রেও ফাতাহ আন্দোলনের ভূমিকা ছিল যথেষ্টই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এরপর থেকেই ঐ স্বশাসনের ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তাদের ভূমিকা হয়ে উঠতে শুরু করে নরমপন্থী। রাষ্ট্রসংঘ ও মার্কিন মধ্যস্থতায় ইজরায়েলের সাথে আপসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় বা ঐরকম কার্যকলাপের মধ্যেই ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে ফাতাহ আন্দোলনের মূল উদ্যোগ। এমনকী প্যালেস্তিনীয়দের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশ্নেও তাদের ভূমিকা হয়ে উঠতে শুরু করে ধীরে ধীরে কিছুটা আপসমুখী। এই অবস্থায় স্বভাবতই প্যালেস্তিনীয়দের স্বাধীনতার তীব্র লড়াকু আকাঙ্ক্ষার সাথে তাদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্যহীনতা প্রকট হতে শুরু করে। ফলে প্যালেস্তিনীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে নতুন করে জড় হতে শুরু করে 'হামাস' প্রভৃতি আপসহীন লড়াকু সংগঠনের পিছনে, যারা স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনওরকম সমঝোতায় খুব একটা বিশ্বাসী নয়। সম্প্রতি সে দেশের স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে হামাসের বিপুল জয় বাস্তবে তাদের উপর দেশবাসীর এই নতুন আস্থারই প্রতিফলন।

কিন্তু প্যালেস্তিনীয়দের স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে হামাসের এই জয় বিশ্বে গণতন্ত্রের স্বঘোষিত ঠিকাদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার মদতপুষ্ট ইজরায়েলি সাম্রাজ্যবাদ কারুর ক্ষেত্রেই সহজে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ তাদের মতে 'হামাস' নাকি এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীরা বর্তমানে যে 'সন্ত্রাসবিরোধী' যুদ্ধে রত, তার পরিপ্রেক্ষিতে নাকি হামাসের এই জয় মেনে নেওয়া যায় না। অতএব গণতন্ত্রের সমস্ত রীতিনীতির কোনও তোয়াক্কা না করে আবার শুরু হল নির্লজ্জ আগ্রাসন। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের রাজধানী রামাল্লায় অধিষ্ঠিত ফাতাহ নেতৃত্বকেই একমাত্র প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে একদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শুরু হল আলোচনার নাটক। অন্যদিকে 'হঠকারী' প্যালেস্তিনীয় জনগণকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুরু হল অন্য ব্যবস্থা নেওয়া। গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে একেবারে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হল। বন্ধ করে দেওয়া হল খাদ্য, ওষুধ বা সমস্তরকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগানও। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র হাতে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী ঘিরে ধরল সমগ্র এলাকা দুটি। তার সাথে যোগ দিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনীও। অজুহাত অস্ত্রের চোরাচালান বন্ধের ব্যাপারে নজরদারি করা। পাঁচিল তুলে এলাকা দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে। সরকারিভাবে অবশ্য বলা হল, এই অবরোধের একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্যালেস্তিনীয়দের তরফ থেকে ইজরায়েলি বসতির উপর রকেট হানা বন্ধ করা।

২০০৭ সালের জুন মাসে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে শুরু হওয়া এই পাশবিক অবরোধের সবচেয়ে বিষময় ফল দেখা গেল গাজায়। এলাকাটি একে বিচ্ছিন্ন, অনুর্বর ও ছোট্ট, তায় গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দফায় দফায় উৎখাত হওয়া সহায় সম্বলহীন ১৫ লক্ষেরও বেশি প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তুর সমাবেশ ঘটেছে। বিশেষ করে খাদ্য, ওষুধ ও জ্বালানির ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আমদানি নির্ভর এই অঞ্চল। এই এলাকার মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি সহ সমস্তরকম জোগান বন্ধ করে দেওয়া হল। লক্ষ্যটা ছিল জলের মতোই পরিষ্কার। গাজার প্যালেস্তিনীয় মানুষকে একরকম ভাতে মেরে শিক্ষা দেওয়া, তাদের হামাস-এর বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করা এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধ আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া।

অবরোধের সপক্ষে ইজরায়েলি শাসকদের অজুহাত

এই অবরোধের কারণ হিসাবে দেখানো তথাকথিত ভয়াবহ প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি রকেট হানার বিষয়টি নেহাতই এক অজুহাত। অত্যাধুনিক মার্কিন প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইজরায়েলি বাহিনীর নিরন্তর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে প্যালেস্তিনীয় জনগণের পাল্টা প্রতিরোধ আক্রমণের এক বড় অস্ত্র যদিও এই রকেট, আদিম প্রযুক্তিতে তৈরি এইসব রকেটের পাল্লাও যেমন কম, ধ্বংস ক্ষমতাও নিতান্তই স্বল্প। বাস্তবে ঐ ধরনের রকেট আক্রমণে ইজরায়েলি বাহিনীর খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি হওয়া কোনওভাবেই সম্ভবও নয়। তার উপর গত ২৪ জানুয়ারি সিরিয়ার এক সাংবাদিক সম্মেলনে হামাসের রাজনৈতিক মুখপাত্র খালেদ মেশাল যখন জানান যে, তাঁদের দিক থেকে কৌশলতভাবে বিগত কয়েক মাস টানা রকেট হানা বন্ধ রাখা সত্ত্বেও ইজরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসী আক্রমণ এক মুহূর্তের জন্যও কখনো বন্ধ হয়নি (২৪ জানুয়ারি,

ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্কিন-ইজরায়েলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে (বাঁদিক থেকে) বাফেলো, নিউইয়র্ক ও সান দিয়েগোতে গণবিক্ষোভ

গাজায় অবরুদ্ধ প্যালেস্তিনীয় জনগণ ইজরায়েলি পাঁচিল ভেঙে দিল

পাঁচের পাতার পর

প্যালেস্তাইন ইনফরমেশন সেন্টার), তখন ইজরায়েলি অজুহাতের চরিত্র আরও স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

অপরদিকে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা এই অবরোধের ফলে গাজার সাধারণ মানুষের অবস্থা কিন্তু হয়ে দাঁড়ায় শোচনীয়। খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসেরই প্রচন্ড অভাব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রায় সম্পূর্ণ অনাহারে বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও, প্যালেস্তিনীয় জনগণের মনোবলে কোনওরকম চিড় ধরানো সম্ভব হয়নি। বরং প্রতিরোধ সংগ্রামে দৃঢ়সংকল্প হামাস-এর পিছনেই তাদের সমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকী পূর্বতন ফাতাহ সমর্থকরাও এই পর্বে ধীরে ধীরে হামাসের কাছাকাছি হতে শুরু করে। ফলে ইজরায়েলি আগ্রাসনবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন এক নতুন মাত্রা অর্জন করে। ফাতাহ নেতৃত্বের আপসমুখী কার্যাবলী আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন এই অবস্থাতেও তারা মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যস্থতায় ইজরায়েলের সাথে আনাপোলিস শান্তিবৈঠকে যোগ দেয়। বৈঠকের আলোচনায় অবরুদ্ধ গাজার মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা সম্পূর্ণ অনুল্লেখিতই থেকে যায়।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিও বন্ধ করা হল

দীর্ঘ ছয়মাসেরও বেশি সময় ধরে এই দানবীয় অবরোধের মাধ্যমেও যখন নিরস্ত্র প্যালেস্তিনীয় মানুষের মনোবলে কোনওরকম চিড় ধরানো সম্ভব হল না, তখন মার্কিন ও ইউরোপীয় মদতপুষ্ট ইজরায়েলি সাম্রাজ্যবাদ আরও কঠোর রাস্তা ধরল। ১৭ জানুয়ারি, ২০০৮ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহের লাইনও পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। সমগ্র গাজা ডুবে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। ভেঙে পড়ল এমনকী পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অত্যাবশ্যকীয় হাসপাতাল পরিষেবাও। তারপরও চলতে থাকল যখন তখন ইজরায়েলি বিমান হানা। ঘোষিত লক্ষ্য তথাকথিত জঙ্গী ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করা, সাধারণ মানুষকেই সর্বদা হতে হল তার অসহায় শিকার। এককথায় সমস্ত গাজায় জনজীবন হয়ে উঠল একরকম নরকের সদৃশ।

অবরুদ্ধ গাজার অবস্থা তখন প্রায় এক বিস্তীর্ণ কয়েদখানার মতো। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ সেখানে বন্দী। সর্বাগ্রে তখন দরকার জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম জোগান ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করা। কিন্তু তার চারদিক ঘিরেই অবস্থান করছে সশস্ত্র ইজরায়েলি পাহারা। সামান্য মাছি গলবারও উপায় সেখানে নেই। জড়ো হতে শুরু করল গাজার বাসিন্দা নিরস্ত্র প্যালেস্তিনীয় মানুষ। বারে বারে আবেদন করা হল মিশরের কাছে, সীমান্ত খুলে দেওয়ার জন্য।

মিশরের শাসকদের কাপুরুষোচিত ভূমিকা

কিন্তু প্রমাদ গুণল মিশরের সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী সরকার। দেশের মানুষের প্যালেস্তাইনের মানুষের প্রতি যতই সমবেদনা ও সহানুভূতি থাক, মিশরের সরকার হিসাব কষতে শুরু করল, প্যালেস্তাইনের মানুষের আবেদনে তারা সাড়া দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইজরায়েল সরকার বেজায় ক্ষুব্ধ হবে। প্যালেস্তাইনের মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার কথা তারা ভাবতেও পারল না। মিশরের সীমান্তবর্তী বাহিনীকেও সেই মর্মে নির্দেশ পাঠানো হল কড়াভাবে সীমানা পাহারা দেবার জন্য। ফলে ২২ জানুয়ারি গাজার কয়েক হাজার বুভুক্ষু মহিলা সীমানা খুলে দেবার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে মিশরীয় রক্ষীবাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও রীতিমতো রক্ত ঝরিয়ে সেই বিক্ষোভ দমন করা হয়।

ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল সীমানা পাঁচিল

এরপরেই প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষ ঠিক করে আবেদন নিবেদনের পথ থেকে এবার অন্য রাস্তা নিতে হবে। সেদিনই গভীর রাতে ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মিশরের সাথে সীমানা পাঁচিল প্রথমে দুই জায়গায় ও পরে আরও এক জায়গায় উড়িয়ে দেওয়া হয়। আর পথ খোলা পেয়ে তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নিরস্ত্র মানুষ অবরুদ্ধ গাজা ছেড়ে বেরিয়ে আসে মিশরে। দৃশ্যতই বিহ্বল মিশরীয় রক্ষীরা তাদের প্রতিরোধের চেষ্টাও করেনি। তাদের মধ্যে বহু রক্ষীর চোখে মুখেও ফুটে ওঠে শোষিত নিরস্ত্র গাজাবাসীর প্রতি সমবেদনার রেখা। পরবর্তী ৩ দিন ধরে ক্রমাগত দলে দলে প্যালেস্তিনীয় মানুষ গাজা ছাড়ে। হিসাব মতো এদের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ, অর্থাৎ অবরুদ্ধ গাজার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। কিন্তু প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে তারা আবার দেশেই ফিরে আসে। অনেকে এই উদ্দেশ্যে এমনকী উটে টানা খালি গাড়ি নিয়ে যায় এবং সেগুলি মিশরের বাজার থেকে কেনা খাবারদাবার ও রসদে পরিপূর্ণ করে আবার দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

টানা তিনদিন ধরে খোলা সীমান্ত দিয়ে অবাধে যাতায়াত চলতে থাকে। উভয়দেশের জনগণই পরস্পরের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। হামাস-এর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে সহযোগিতার কথা বলে রামাল্লার ফাতাহ্ নেতৃত্বের সাথেও কথা বলা হয়। কিন্তু ফাতাহ্ নেতৃত্ব স্বভাবতই সেই বন্ধুত্বের হাত প্রত্যাখ্যান করে।

সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত প্রকার চাপ ও আক্রমণ উপেক্ষা করে গাজার প্যালেস্তিনীয় অধিবাসীদের এই সীমান্ত পাঁচিল ভাঙা ও মিশর থেকে রসদ সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে আবার প্রমাণ হল স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে তারা আজও কৃতসংকল্প। সাম্রাজ্যবাদীদের কোনও আক্রমণই তাদের এই স্বাধীনতার স্পৃহা বা তার জন্য আপসহীন লড়াই চালাবার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে সক্ষম নয়। এমনকী তাদের নেতৃত্ব যদি কখনও আপসের পথে হাঁটতে শুরু করে, তবে তারা তাদেরও ত্যাগ করে নতুন নেতৃত্বের পিছনে জড়ো হতেও মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত নয়। শর্ত একটাই, সেই নতুন নেতৃত্বকেও হতে হবে ঐ স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসহীন ও সেই উদ্দেশ্যে লড়াই-এর প্রতি একনিষ্ঠ। হাজার কষ্ট সহ্য করতেও তাদের আপত্তি নেই, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, উগ্র ইহুদিবাদ বিরোধী স্বাধীনতার লড়াই থেকে একচুলও পিছু হটতে তারা রাজি নয়। ঠিক এই কারণেই গাজার ফাতাহ্ সমর্থকরাও আজ গত ছ'মাসের এই অনাহারের বিরুদ্ধে লড়াই ও পাঁচিল ভাঙার ঘটনার মধ্য দিয়ে হামাসের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। গাজা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় ২৩ জানুয়ারি নেওয়া নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাথে ইন্টারভিউ-এও বেশ কয়েকজন ফাতাহ্ সমর্থক তাদের এই মত ব্যক্ত করেছে।

ইজরায়েলি আক্রমণ বন্ধ হয়নি, রক্তক্ষয়ী লড়াই চলবেই

কিন্তু গাজার মানুষের বিপদ শেষ হয়নি। মিশর বর্তমানে ঐ ভাঙা পাঁচিল মেরামত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের শাসকদের আশঙ্কা— এই ফাটল বজায় থাকলে ইজরায়েল গাজাকে তার সমস্ত বাসিন্দা সহ মিশরের হেফাজতেই ঠেলে দিতে পারে, যাদের দায়িত্ব নিতে মিশরের শাসকবর্গ মোটেই আগ্রহী নয়। অন্যদিকে ইজরায়েল তার অবরোধ বজায় রেখেছে। যত্রতত্র বিমানহানাতেও এতটুকু বিরাম নেই। আর তাদের পৃষ্ঠপোষক মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ গাজা সমস্যার মানবিক দিকটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে পুরো বিষয়টিকে শুধুমাত্র ইজরায়েলের নিজস্ব নিরাপত্তার সমস্যা হিসাবে দেখতেই আগ্রহী। তাই সারা পৃথিবীর শান্তিকামী সাধারণ মানুষেরই আজ উচিত গাজার প্যালেস্তিনীয়দের পাশে দাঁড়ানো এবং সেখানে ইজরায়েল আরোপিত ঘৃণ্য অপরাধমূলক অবরোধের অবিলম্বে অবসানের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা। গত ২৫, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা, লেবানন, সিরিয়া, মিশর সহ পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন শহরে এই দাবিতে তীব্র আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন গাজার অত্যাচারিত প্যালেস্তিনীয়দের প্রতি ভ্রাতৃসম সহমর্মিতাই প্রকাশ করেছে।

শেয়ার বাজারে ধস

চারের পাতার পর

বাজারদর আরও নেমে যাওয়া — এর ধাক্কায় গত জানুয়ারিতে ভারতের শেয়ারবাজারে ধস নেমেছে। আবার অতি সম্প্রতি মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমানোয় ভারতের শেয়ারবাজারের বিদ্যমান লাভটা অন্যত্র বিনিয়োগের চেয়ে বেশি হওয়ায় লগ্নিকারীরা ফিরছে এবং শেয়ারবাজার আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। শেয়ারবাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর ঘটনা, বা এই ধরনের সংকট পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মাঝে মাঝেই ঘটে।

সংকট থেকেই আপনাআপনি পুঁজিবাদ ধ্বংস হয় না

মার্কিন অর্থনীতির অয়েল শক বা ডলার সংকটের কথা প্রায়শই শোনা যায়। কয়েক বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যে সংকট দেখা গিয়েছিল, তা ছিল নজিরবিহীন। সংকটের ফলে কোনও কোনও দেশে মূল্যবৃদ্ধির হার ৩০০ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে ছাঁটাই, দারিদ্র্যবৃদ্ধি মাত্রাছাড়া হারে ঘটেছে। সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে শেষপর্যন্ত পুঁজিবাদ টিকে গিয়েছে। এইভাবে বারবার সংকটের কবল থেকে পুঁজিবাদের বেরিয়ে আসার ঘটনা দেখিয়ে একদল 'বিশেষজ্ঞ' প্রায়শই বলে থাকেন, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদের মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা শক্তি আছে, যার জোরে সে সংকট কাটিয়ে উঠছে। মার্কসবাদ যে বলে সংকটের ধাক্কায় পুঁজিবাদ ধসে পড়বে, ইতিহাসে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাই পুঁজিবাদের মধ্যে কিছু সংস্কারমূলক আন্দোলন হতে পারে, কিন্তু পুঁজিবাদের উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্রের ভাবনা অবাস্তব, অনৈতিহাসিক। পুঁজিবাদই ইতিহাসের শেষ কথা।

কিন্তু এই বিশেষজ্ঞরা যে কথার জবাব দেন না, তা হল, পুঁজিবাদ যদি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাই হত, তাহলে সেই ব্যবস্থা এবেলা ওবেলার সংকটে পড়ছে কেন, ক্রমাগত মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে কেন, কেন দেশের শ্রমজীবী মানুষের আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার বদলে আয়ের সুযোগ ক্রমাগত কমিয়ে আনছে? কেন বেকার বাড়ছে? কেন পুঁজিবাদ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ডেকে আনছে? সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তো এ জিনিস ঘটেনি। তাছাড়া কেবল সংকটের চাপেই পুঁজিবাদ ভেঙে পড়বে, এমন কথা মার্কসবাদ কোথায় বলেছে, তা কেবল ওই সব 'বিশেষজ্ঞরা'ই বলতে পারেন। প্রকৃত মার্কসবাদীরা জানেন, আপন নিয়মে পুঁজিবাদ ভেঙে পড়বে — এটা মার্কসের শিক্ষা নয়। এ প্রসঙ্গে মার্কস ও লেনিনের শিক্ষাকে তুলে ধরে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে কমরেড স্ট্যালিন বলেছেন —''Victory never comes of itself – it is usually won by effort.'' (বিপ্লবের বিজয় আপনাআপনি ঘটে না। কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করতে হয়।) মার্কসবাদ শিখিয়েছে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট বিপ্লবের বস্তুগত জমি তৈরি করে, কিন্তু যতদিন না বিপ্লবের ভাবগত ক্ষেত্রটি তৈরি করা যাচ্ছে, ততদিন বিপ্লব হবে না। সর্বহারা সংস্কৃতির আধারে বিপ্লবের আদর্শগত দিকটি তৈরি করে সর্বহারাশ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দল, যাকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের চিন্তা বাতুলতা। এই লক্ষ্য থেকেই যথার্থ মার্কসবাদীরা পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিটি সংকটের ও সমস্যার চরিত্র বিশ্লেষণ করে জনগণকে দেখায় যে, আর্থিক সংকট, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক-নৈতিক সংকট ইত্যাদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য, যার থেকে মুক্তি পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করে পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবীরা যেমন বিপ্লবের জন্য এই চেষ্টা করে যায়, আবার বিপ্লবকে রুখবার জন্য নানা নামের ও রঙের বিপ্লববিরোধী শক্তি সমাজের মধ্যে কাজ করে। এ ক্ষেত্রেও একটা তীব্র আদর্শগত লড়াই চালিয়ে বিপ্লববিরোধী ঐ শক্তিগুলির প্রভাব থেকে জনতাকে মুক্ত করার জন্য কঠিন সংগ্রাম চালাতে হয়।

কাজেই শেয়ারবাজারের সংকটই হোক বা আরও গভীরতর কোনও সংকটই হোক, পুঁজিবাদ তা সত্ত্বেও টিকতে পারছে এই কারণেই যে, এ দেশে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে-গড়া যথার্থ বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই অবস্থান করলেও বিপ্লব সফল করার উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তি সে আজও অর্জন করতে পারেনি। যতদিন সেই শক্তি অর্জিত না হচ্ছে, ততদিন বারবার সংকটে পড়েও পুঁজিবাদ টিকে থাকবে, জনজীবনকে সমস্ত দিক থেকে সমস্যায় জর্জরিত করবে, নীতি-নৈতিকতা ধসিয়ে দিতে থাকবে, তবু পুঁজিবাদ ধ্বংস হবে না। কিন্তু তার দ্বারা এটা কখনই প্রমাণিত হয় না যে, মার্কসবাদ ভুল, সমাজতন্ত্র অসম্ভব, এবং পুঁজিবাদ অপরাজেয়।

সাঁইথিয়া বিডিও অফিসে মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও সরকারি রেটে মজুরি প্রদান, বাতিল পাতার মূল্য শ্রমিকের কাছ থেকে কেটে না নেওয়া, বিড়ি শ্রমিক বস্তিতে বিদ্যুতায়ন, স্থায়ী ও মোবাইল চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন এবং বিড়ি শ্রমিকদের বাড়ি তৈরির অনুদানের দাবিতে সাঁইথিয়া ব্লকের দুই শতাধিক মহিলা বিড়ি শ্রমিক ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বীরভূম বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৩১ জানুয়ারি বিডিও সাঁইথিয়াকে একটি বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে স্মারকলিপি দেয়। বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সম্পাদক ব্রজমোহন দাস, সহসম্পাদক আব্দুস সালাম, লালন দাস, নাসকুল সেখ, আকবর সেখ ও সেখ আব্দুল হান্নান। বিডিও দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। বিক্ষোভ শেষে মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে বিডিও অফিসের চত্বরে একটি সভা হয় এবং পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রজমোহন দাস ও আব্দুস সালাম। পরে তাঁরা আহমদপুরের বিড়ি শ্রমিকদের বস্তি ঘুরে দেখেন। সমগ্র কর্মসূচিতে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

কোনও প্রতিবাদই সহ্য করতে রাজি নয় সিপিএম

একের পাতার পর

এই ঘটনার পর সিপিএম নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? 'মৃত্যু দুঃখজনক' কথাটা মামুলিভাবে বলে নিয়ে পরমুহূর্তেই তাঁরা বলেছেন, 'পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে', ঠিক যেভাবে একদিন প্রতিটি গণআন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের পক্ষে কংগ্রেস সরকার সাফাই দিত। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, গণআন্দোলনে পুলিশ যাবে না— এটাই তো সিপিএম সরকারের ঘোষিত নীতি, তা হলে তাদের আমলে পুলিশ ও ক্রিমিনাল বাহিনী দিয়ে নৃশংসভাবে ক্রমাগত গণআন্দোলন দমন করা হচ্ছে কেন? এমনকী শরিক দলের আন্দোলন নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে দমন করতেও তাদের আটকাচ্ছে না। মরিচঝাঁপিতে, বন্দর শ্রমিকদের আন্দোলনে, অন্যান্য শ্রমিক আন্দোলনে, ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে অসংখ্যবার এ সরকার লাঠি-গুলি চালিয়েছে, হত্যা করেছে, সর্বশেষ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে এ সরকারের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী ভারত তথা বিশ্ব জানে।

জেনে রাখা দরকার, এই নীতিটা কোনও দিনই সিপিএমের ছিল না। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় এস ইউ সি আই সর্বপ্রথম 'ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশ যাবে না'— এই নীতিটি সরকারের নীতি হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানায়। সেদিন সিপিএম ও অন্যান্যরা প্রথমে এতে রাজি হয়নি। এস ইউ সি আই যখন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও নির্দেশের ভিত্তিতে জানিয়েছিল, এই নীতিটি গ্রহণ না করলে এস ইউ সি আই যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগ দেবে না, তখনই অন্যান্যরা অন্তত মুখে এটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সরকারি নীতি হিসাবে এটি প্রথম ঘোষিতও হয়েছিল শ্রমমন্ত্রী হিসাবে এস ইউ সি আই নেতা প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর পক্ষ থেকে। এই ঘোষণা সেদিন এ রাজ্যের শোষিত মানুষের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা এবং গণআন্দোলনে কী প্রবল জোয়ার এনেছিল, গোটা দেশে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে কী ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, ইতিহাসে তা লেখা রয়েছে। সিপিএম যেমন কোনও দিনই মার্কসবাদী দল ছিল না, তেমনই এই নীতিটিও তারা কোনও দিন মন থেকে সমর্থন করেনি। ১৯৭৭ সালে রাতারাতি তথাকথিত বামফ্রন্ট গড়ে সিপিএম যখন সরকারে যাওয়ার ছক কষছিল, সেই সময় নির্বাচনের আগে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে আর 'অশান্তি' হবে না; প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় অশান্তি হয়েছিল এস ইউ সি আইয়ের জন্য, এবার বামফ্রন্টে এস ইউ সি আই নেই। বোঝাই যায়, জ্যোতি বসু এ কথার দ্বারা ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীকেই আশ্বস্ত করেছিলেন তাদের আশীর্বাদে ও সমর্থনে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য।

সিপিএমকে ৩০ বছর ধরে বুর্জোয়াশ্রেণী সরকারে রেখেছে এই শর্তেই যে, তারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে হত্যা করবে। শোষকশ্রেণীর প্রতি এই দায়বদ্ধতা সিপিএম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। তাই যত দিন গেছে, নির্মম শোষণে জর্জরিত হয়ে জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ যত বেড়েছে, সুযোগ পেলেই তা যত ফেটে পড়েছে, ততই বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে নিজেদের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে সিপিএম সরকার গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে অত্যাচারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে কোনও আন্দোলনে শরিক দল আছে কি নেই — এটা আজ সিপিএমের কাছে কোনও বিচার বিষয় নয়। এমনকী সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুও যদি কোথাও চাপে পড়ে যথার্থ শ্রমিক আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়, তবে হলফ করেই বলা যায়, তাকেও সিপিএম রেয়াত করবে না। সিপিএম আজ ফ্যাসিস্টসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই চলছে। এ কারণেই আমরা ফরওয়ার্ড ব্লক ও শরিক দলগুলির নেতৃত্বকে বলছি, সিপিএমের মধ্যে বামপন্থার লেশমাত্র আর নেই, অতএব বামপন্থার প্রতি, জনস্বার্থের প্রতি যদি ফ ব-আর এস পি নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা এখনও থাকে, তবে বামফ্রন্ট ছেড়ে তাঁদের বেরিয়ে আসা উচিত। এ সরকার বামপন্থীও নয়, এমনকী গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতিও এই সরকারের কোনও শ্রদ্ধা নেই। আবার তথাকথিত বামফ্রন্টও বাস্তবে কোনও ফ্রন্ট নয়, সিপিএমের হুকুমই সেখানে শেষ কথা।

আমরা মনে করি, চরম জনবিরোধী, অত্যাচারী এই সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও বিজেপি বাদে সমস্ত বাম ও অবাম দল ও সংগঠনসহ সাধারণ মানুষকে নিয়ে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর মডেলে সর্বত্র গণকমিটি গঠন করে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা আজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের অফিস উদ্বোধন বহরমপুরে

১২ জানুয়ারি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত। ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন জেলা এমএসসি'র সভাপতি ডাঃ প্রণব সেন। এই উপলক্ষে খাগড়ায় চেম্বার অফ কমার্সের হলে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল জ্বর ও মেডিকেল এথিক্স। জ্বর ও তার কারণ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ নির্মল সাহা। তিনি আলোচনায় সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দুরবস্থা এবং তার উন্নতির বিষয়ে আলোকপাত করেন।

মেডিকেল এথিক্স নিয়ে আলোচনা করেন ডাঃ অশোক সামন্ত। তিনি বলেন, মেডিকেল এথিক্স শুধু আলোচনা নয়, নিজের জীবনে যতটা সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে। এমএসসি'র সংগঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রণব সেন, অবনীশ সিন্হা, ডাঃ এম সবুর, ডাঃ পারভেজ আলম, ডাঃ মাইজুদ্দিন, ডাঃ জহিরুদ্দিন, ডাঃ কাইমুল ইসলাম, ডাঃ খাগিরুদ্দিন আহমেদ, ডাঃ কবিরুল আলম সহ শতাধিক চিকিৎসক। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এমএসসি-র জেলা সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম। সেমিনারে আলোচনায় উৎসাহিত উপস্থিত প্রতিনিধিরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই রকম সেমিনার করার প্রস্তাব দেন।

ভয়াবহ লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে মেদিনীপুরে পাওয়ার হাউস ঘেরাও

লোডশেডিং-এর জ্বালায় জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত। সারা শীতকাল জুড়ে চলছে বিদ্যুতের বিপর্যয়। বারবার বিভিন্ন দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েও কোনও ফল হয়নি, বরং লোডশেডিং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

এস ইউ সি আই মেদিনীপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২২ জানুয়ারি মেদিনীপুর শহরে মূল বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস, পাওয়ার হাউস ঘেরাও-এর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্নেলগোলা থেকে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে যখন পাওয়ার হাউসে পৌঁছায় ততক্ষণে বহু সাধারণ মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। মিছিল সোজা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরের সম্মুখ অবরোধ করে এবং তাদের সঙ্গে উপস্থিত জনসাধারণ যুক্ত হয়ে সারা অফিস বিক্ষোভকারীতে ভরে যায়। মিছিল পৌঁছানোর আগেই এ ই অফিস থেকে উধাও হয়ে গেছেন, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র বিল জমা দেওয়ার কাউন্টারে লাইনে দাঁড়ানো গ্রাহকরা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং বিল কাউন্টার বন্ধ করে দিয়ে তাঁরাও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। গোটা অফিস চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে বন্দুক হাতে পুলিশ ঢুকলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়।

দীর্ঘক্ষণ পরে অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে এ ই দপ্তরে ঢুকলে তাকে ঘিরে বিক্ষোভকারীরা বিদ্যুৎ সরবরাহের বিপর্যয় কাটানোর সময়সীমা ঘোষণা করার দাবি জানাতে থাকেন। প্রবল চাপে এ ই প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে একে একে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে থাকেন। অবশেষে জোনাল ম্যানেজারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা হয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আন্দোলনকারীরা জোনাল ম্যানেজারকে পরিষ্কার জানান, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হলে জোনাল ম্যানেজারের দপ্তর ঘেরাও করা হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই লোকাল কমিটির সদস্য দিলীপ দাস, কল্পনা মজুমদার, মানিক পড়্যা, ঝন্টু নায়ক প্রমুখ।

ই সি এল অন্তর্গত কয়লাখনি শ্রমিকদের সম্মেলন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত কোল মাইনার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ই সি এল শাখার উদ্যোগে ২ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলার ঝাঁঝরা অডিটোরিয়ামে কয়লাখনি শ্রমিকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ই সি এল অন্তর্গত বিভিন্ন খনি থেকে শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। বিশিষ্ট খনি শ্রমিক নেতা আর কে পি সিংয়ের সভাপতিত্বে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। শুরুতে আমৃত্যু বিপ্লবী, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক কমরেড তাপস দত্তের স্মরণে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড অমর চৌধুরী এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড নবনী চক্রবর্তী। প্রস্তাবে বলা হয়, বিগত দুই দশক ধরে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সমস্ত সরকারই শুধু নয়, রাজ্য সরকারগুলিও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিশ্বায়নের নীতি কার্যকর করে চলেছে। ফলে কয়লা শিল্পেও বেসরকারীকরণ, ঠিকাদারীকরণ, আউটসোর্সিং ব্যাপকভাবে চলছে; খাদান বন্ধ করা হচ্ছে। সম্প্রতি ই সি এল কর্তৃপক্ষ ২৭টি খাদান বন্ধ করতে চাইছে। খনি নিরাপত্তার প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের, কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের এবং রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, ধস-গ্যাস-আগুনে শ্রমিকের মৃত্যু, বৈধ-অবৈধ সমস্ত খাদানেই আজ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খনি অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-জীবিকাও বিপন্ন হচ্ছে। অথচ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ভূগর্ভস্থ এলাকার মানচিত্র তৈরি করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধস-গ্যাস-আগুন প্রতিরোধ করা যায়। এর জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষের কোনও গরজ নেই। বরং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় অসাধু কিছু অফিসার ও পুলিশ-প্রশাসনের যোগসাজসে মাফিয়া চক্র গড়ে উঠেছে এবং বেআইনি খাদান সহ ব্যাপক কয়লা চুরি, দুর্নীতি এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে ২৭টি কোলিয়ারি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা, বেসরকারীকরণ, ঠিকাদারীকরণ ও আউটসোর্সিং বন্ধ করা, ধস-গ্যাস-আগুন প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অবৈধ খাদান বন্ধ করা, এনসিডব্লুএ-৮ চুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার সুযোগ ও পেনশনের সাথে ডিএ যুক্ত করে পেনশনের হার বাড়ানো, ঠিকা শ্রমিকদের ই সি এল শ্রমিকদের সমহারে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া, জমিহারাদের চাকরি দেওয়া এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত 'কোল মাইনার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'-কে জে বি সি সি আই-তে অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি ১২ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন রাখা হয়। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সম্মেলনের মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন কমরেডস্ কেষ্ট বাউরী, মহেন্দ্র প্রসাদ, লক্ষ্মীকান্ত বাউরী, বিকাশ দাস, প্রভাত পাল, ইনতিয়াজ হোসেন, বিনয় ভট্টাচার্য, অমর চৌধুরী, বাবলা ভট্টাচার্য, এস এস ঠাকুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হিন্দুস্তান কেবলস্-এর বিশিষ্ট নেতা কমরেড প্রবীর চ্যাটার্জী এবং স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিশিষ্ট নেতা কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক ও কোল মাইনার্স ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড সুনীল মুখার্জী। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিশ্বায়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই প্রয়োজনেই আগামী ২৭-২৯ মার্চ দিল্লিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে শুধু বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমিক প্রতিনিধিরা নয়, ভারতের বাইরে থেকেও বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ডি কে মুখার্জী ও কমরেড বিমল জানা।

আগামী দিনে ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতিতে ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চ ই সি এল এলাকায় উপরোক্ত ১২ দফা দাবিতে 'দাবি সপ্তাহ' পালন করা হবে এবং খনি শ্রমিকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, সভা-সমাবেশ, দাবি ব্যাজ পরানো ও অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালানো হবে।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে পাওয়ার হাউস ঘেরাও

মেদিনীপুরে এস ইউ সি আই-এর পাওয়ার হাউস ঘেরাও (সংবাদ ৭ পাতায়)

রায়পুরে স্বাস্থ্য-কর্মচারীদের সর্বভারতীয় মহাসম্মেলন

গত ২৫ নভেম্বর 'ছত্তিশগড় প্রদেশ স্বাস্থ্য কর্মচারী সংঘ'র ব্যবস্থাপনায় রায়পুরে স্বাস্থ্যকর্মচারীদের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দিল্লি, ইউ পি, হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরালা, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যের এবং ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে আসা পাবলিক হেলথ কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

২৫ নভেম্বর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে স্বাস্থ্যকর্মীদের এই ঐতিহাসিক জমায়েত, পাবলিক হেলথ কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা এবং সঠিক যাত্রাপথের দৃঢ় সূচনা। দিল্লিতে ইন্ডিয়ান পাবলিক হেল্‌থ কর্মচারীদের অভূতপূর্ব ও সাড়া জাগানো জাতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্তে সংগঠিত 'ন্যাশনাল পাবলিক হেলথ অ্যালায়েন্স' (NPHA) নামে, জেপিএ-র অন্তর্ভুক্ত যে সংগঠনটি গড়ে উঠেছে, তার আহ্বানে ছত্তিশগড় প্রদেশের ১৬টি জেলা থেকে প্রায় ১৬০০ স্বাস্থ্য কর্মচারীর সম্মেলনে যোগদান করেন। ছত্তিশগড় সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দুই সহস্রাধিক কর্মচারী এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে ন্যাশনাল পাবলিক হেলথ্ অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক রামবাবু পাণ্ডে তাঁর কার্যবিবরণী পাঠ করতে গিয়ে, ১৫ নভেম্বর ২০০৬-এ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনপিএইচএ-এর জাতীয় অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা এবং ছত্তিশগড়ের বহু প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।

মূল ভাষণে, জেপিএ-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অচিন্ত্য সিনহা বলেন, আমাদের দেশের সরকার দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পাহাড় প্রমাণ মুনাফার স্বার্থে ভারতীয় গণস্বাস্থ্য পরিষেবার বাজার বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের অজুহাতে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চায়। ভোটের মাধ্যমে সরকার বদলায়, নীতি বদলায় না। ফলে আমরা সংসদীয় রাজনীতি-নির্ভর দলের উপর ভরসা রাখতে পারি না। আমাদের নিজস্ব শক্তির উপর ভরসা করে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। কমরেড সিন্‌হা আরও বলেন, জেপিএ এ ব্যাপারে ৩-এস ফরমূলা দাবি করে এবং ৩-ডি ব্যবস্থা বাতিল করতে চায়।

৩-এস-এর দাবি যা গ্রহণ করতে হবে তা হল, গণস্বাস্থ্যের সুরক্ষা। গণস্বাস্থ্য বিভাগের সুরক্ষা। স্বাস্থ্য কর্মীদের সুরক্ষা।

৩-ডি যা বাতিল করতে হবে, তা হল,

গণস্বাস্থ্য বিভাগের অবমূল্যায়ন। গণস্বাস্থ্য বিভাগের নিম্নমানের পরিষেবা। গণস্বাস্থ্য দপ্তরের ছাঁটাই।

কমরেড সিনহা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ৩টি পদ্ধতি গ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন — (১) প্রিভেনটিভ, (২) কিউরেটিভ এবং (৩) প্রোমোটিভ। প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় ও নির্মূলের ব্যবস্থা এবং উৎকর্ষ প্রদানের ব্যবস্থা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা পরিষেবাকে একই ব্যবস্থাপনার আওতায় মিলিয়ে মিশিয়ে গণস্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে পরিষেবার প্রক্রিয়া চালু করা এবং এটাই করতে হবে।

তিনি তাঁর ভাষণের সমাপ্তি পর্বে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দেন এনপিএইচএ-কে সার্বিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বজ্র কঠোর হাজারো কণ্ঠে সমাবেশে প্রতিধ্বনিত হলো অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার। এই সম্মেলন সফল করার ক্ষেত্রে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ও পি শর্মা এবং তাঁর সহকর্মীদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী

কেন্দ্র		প্রার্থী
আগরতলা	—	কমরেড শিবানী দাস
বাধারঘাট	—	কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী
ধর্মনগর	—	কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী
রাধাকিশোরপুর	—	কমরেড বিভুলাল দে

মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই লোডশেডিং বন্ধের দাবি

একের পাতার পর

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চাহিদা বেড়েছে ৩৫০ মেগাওয়াট আর কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫০ মেগাওয়াট কম দিয়েছে, অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ৭০০ মেগাওয়াট। এই বিজ্ঞাপনেই বলা হয়েছে, ৯০০ কোটি টাকা খরচ করে পুরুলিয়ায় যে পাম্প্‌ড স্টোরেজ তৈরি হয়েছে সেখানে উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই পাম্প্‌ড স্টোরেজের উৎপাদন ক্ষমতা ৯০০ মেগাওয়াট। তা হলে বিদ্যুৎ ঘাটতি হবে কেন? বিদ্যুৎমন্ত্রী তাঁর ২০০৬-'০৭ সালের বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,১২৫ মেগাওয়াট। তারপর ২০০৬-'০৭ সালের বাজেট ভাষণে জানিয়েছেন, চাহিদার গ্রোথ রেট ৮ শতাংশ, বর্তমানে চাহিদা ৭ হাজার মেগাওয়াটের মতো। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার যতই কম বিদ্যুৎ সরবরাহ করুক, ঘাটতি হতে পারে না। তা হলে হঠাৎ করে এই স্থায়ী লোডশেডিং এলো কোথা থেকে? অ্যাবেকা গত বছর থেকে বার বার বলে চলেছে যে, সরকার মিথ্যা কথা বলছে। এই লোডশেডিং কৃত্রিমভাবে করপোরেট হাউসগুলো তৈরি করেছে।

সরকার তাদের স্বার্থেই সরকারি অর্থ ব্যয় করে মিথ্যা প্রচার করছে। চাহিদা বেড়েছে এ কথা ঠিক, যদি ধরেও নেওয়া হয় কেন্দ্র কম বিদ্যুৎ দিচ্ছে, তবুও রাজ্যের উৎপাদন ক্ষমতা যতটা, ততটা চাহিদা বৃদ্ধি ঘটেনি। প্রকৃত ঘটনা হ'ল, এই সব কর্পোরেট হাউসগুলো বা বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করার জন্যে পিএলএফ (প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর) কমিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে সরকার কোন প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা কত, কত উৎপাদন করা হচ্ছে এবং রাজ্যের প্রকৃত চাহিদা কত, তার কোনও চার্ট প্রকাশ করছে না। আসলে বিশ্বায়নের অর্থনীতি মেনে বিদ্যুতের মতো একটি জরুরি শিল্পে এই সব করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের চাপেই জলবিদ্যুৎ এবং বিকল্প বিদ্যুতের উপর জোর না দিয়ে এখনও তাপবিদ্যুৎ এবং পরমাণু বিদ্যুতের কথা বলা হচ্ছে। সিপিএম সরকার অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বহুজাতিক সংস্থা এবং বিদ্যুৎ শিল্পে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে এই সব করছে। এমনকী সরকার পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রেও ধূর্ততার সাথে এই নীতি কার্যকর করা হচ্ছে।

এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের এই লোডশেডিং থেকে রেহাই দেওয়া যাবে না বলে সরকার নির্লজ্জের মতো বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অথচ এই লোডশেডিং-এর ফলে গরিব-মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের দারুণ ক্ষতি হবে। অ্যাবেকা এর তীব্র বিরোধিতা করছে।

দ্বিতীয়ত, বোরো চাষের সময়ে গ্রামাঞ্চলে এই লোডশেডিং চলছে, ফলে কৃষির মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। রাজ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রান্তিক চাষী, মধ্যচাষীরা এই বোরো চাষের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। মাঠে তাদের ফসল পুড়ে গেলে বহু কৃষককে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে।

অ্যাবেকা সরকারের কাছে দাবি করছে, অবিলম্বে পুরুলিয়া পাম্প্‌ড স্টোরেজ, সাগরদিঘী, বক্রেশ্বরের ইউনিটগুলো চালু করে অথবা চালু প্ল্যান্টগুলোর পিএলএফ বৃদ্ধি করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

এই কৃত্রিম লোডশেডিং-এর বিরুদ্ধে অ্যাবেকা ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সব জেলায় রাস্তা অবরোধ, ৪ মার্চ বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তরে বিক্ষোভ, জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ অফিস অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র ৮ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।

পিটিটিআই ছাত্রদের মিথ্যা মামলায় আটকে রাখার প্রতিবাদে

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

১৩৮টি পিটিটিআই কলেজের ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেটের বৈধতা প্রভৃতির দাবিতে প্রায় দু'বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন চললেও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অপদার্থতার জন্য ছাত্রদের সমস্যার কোনও সমাধানই হয়নি।

এই অবস্থায় ৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিটিটিআই ছাত্রদা প্রাইমারি বোর্ড অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশ অশোক পালুই, প্রতাপ পণ্ডা, বিকাশ ঘোষ ও তপন গোস্বামী সহ ১৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে ও মিথ্যা মামলায় আটকে রাখে। এঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পরের দিন মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ হয়, ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক সমীর বেরা।

এই ঘটনার প্রতিবাদে ৮ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারে ছাত্রদা প্রাইমারি শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করে এবং দপ্তর অফিসে তালা দিয়ে দেয়। পরে ডিএম-এর হস্তক্ষেপে আন্দোলনকারীরা ঘেরাও তুলে নেয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ভজন বর্মন।

এদিনই উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে পিটিটিআই ছাত্রদা সুজন দাসের নেতৃত্বে পথ অবরোধ করে।

আন্দোলনের এই চাপের মুখে প্রায় দীর্ঘ দেড় বছর পর ৮ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে পিটিটিআই সংক্রান্ত মামলার শুনানি শুরু হয়। ডব্লুবিপিটিটিএসইউ-এর রাজ্য সভাপতি আনন্দ হান্ডা ও সম্পাদক প্রবীর ঘোষ পশ্চিম মেদিনীপুরের ১৪ জন পিটিটিআই ছাত্রের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে জেলায় জেলায় বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছেন।

১২ ঘণ্টার মেজিয়া বনধ

একের পাতার পর

ঘটুক, মেনে নিতে হবে, প্রতিবাদ করা চলবে না।'' সাধারণ মানুষ এস ইউ সি আই কর্মীদের সমর্থনে এগিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা তখনকার মতো চলে গেলেও বার বার এস ইউ সি আই কর্মীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে যায়। সাধারণ মানুষ বলেন, 'নেতারা সরাসরি না এসে হার্মাদদের পাঠাচ্ছে। আপনারা জনগণের কথা বলছেন বলে ওদের এত গাত্রদাহ।'

এ সব সত্ত্বেও বনধ ও ছাত্রধর্মঘট পুরোপুরি সফল করার মধ্য দিয়ে জনগণ সিপিএম সরকারের পুলিশি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন। জেলার জনগণ ও ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গণকমিটি গঠনে তাঁদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in